

## চতুর্থ অধ্যায়

# শরদিন্দুর ইতিহাসাণ্ডি উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ

‘কালের মন্দিরা’ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ইতিহাসাণ্ডি উপন্যাস। ১৩৫৮ বাংলা সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালের ৯ই মার্চ মুঙ্গেরে এই কাহিনি রচনার আরম্ভ। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর লেখক কর্মসূত্রে বোম্বাই চলে যান। ফলে উপন্যাসটি আর লেখা হয়নি। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আবার কাহিনি লিখতে শুরু করেন। ১৯৫০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গল্প শেষ করে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন “বারো বছর ধরিয়া মাছের কাঁটার মতো গল্পটা আমার গলায় বিঁধিয়া ছিল। এত দিনে বাহির হইল। বেশ স্বচ্ছ অনুভব করিতেছি।” সমাপ্ত উপন্যাস প্রসঙ্গে শরদিন্দু ডায়ারিতে লিখেছেন “অনেকবার লিখিব মনে করিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি; কিন্তু এ ধরণের উপন্যাস আধখানা মন দিয়া লেখা যায় না। তাই উহা নৃতন করিয়া ধরিতে সাহস হয় নাই। ইতিমধ্যে এই এগারো বছরে কাহিনীর অনেক সূত্র মনের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।... তবু আবার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। গল্পের কাঠামোঠা ভুলি নাই, তাহারই উপর নৃতন করিয়া রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছি। জানিনা, রোমান্সের রঙ আগের মত ফলিবে কিনা। যদি শেষ করিতে পারি পাঠকেরা হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গল্পের কোনখানে এগারো বছরের ব্যবধান।” রোমান্সের ইন্দ্রজাল মঞ্চ পাঠক প্রথম পাঠে এই ব্যবধান ধরতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য হিশেবে শরদিন্দু নিজে দুটি কথা বলেছেন—

১. নিছক গল্প বলা।

২. নানা জাতির মিলনে গড়ে ওঠা এক ভারতসভার কথা বলা।

এই উপন্যাসের শেষাংশ ১৯৪৮ সালে লেখা। এর মধ্যে ১৯৪৬-৪৭ -এ সারা দেশব্যাপী জাতি দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি জুড়ে দিয়েছেন। “যাহারা মানুষে মানুষে ভেদ বুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোগ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচার মৃত্যু নয়—মিথ্যাচারী।” দেশের নানা প্রান্তে এই ভেদবুদ্ধি প্রসূত হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল আর তারো চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল শিল্পী সমাজকে। ১৯৩৮ -এ এ কাহিনি শেষ হয়ে গেলে হয়তো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এত প্রাধান্য লাভ করতো না।

এই উদ্দেশ্য গল্পের মধ্যে মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে নি। বরং গল্প বলাটাই মুখ্য হয়েছে। গল্প

বলতে শরদিন্দু জানতেন। অনেক সময় সেই গল্পের পটভূমিকা হিশেবে তিনি ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন। ইতিহাসের পটভূমিকা আধুনিক মানুষের কাছে প্রায়গুকারে তাকা, অপরিচিত এবং রহস্যপূর্ণ। ইতিহাসিকদের চেষ্টায় তার মোটাদাগের কথাগুলি কিছুটা স্পষ্ট হলেও মানুষের জীবন যাপন, তাদের জীবনের সমস্যা সংকট—বিশেষত উপন্যাসিকের কাছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ— সেকালের মানুষের প্রেম ভালোবাসার কাহিনি কিছুই জানা যায় না। বক্ষিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে সেই অতীতের মানবজীবনের গল্প বলেছিলেন—তাদের প্রেম প্রণয়ের কাহিনি শুনিয়েছিলেন। আরও কেউ কেউ সে কাজ করেছেন। শরদিন্দু সেই অতীত-রহস্যাবৃত জীবনের রোমাঞ্চ-রসকে তাঁর কল্পিত কাহিনির মধ্যে তুলে ধরেছেন। রোমাঞ্চ লেখকেরা রহস্যপূর্ণ কাহিনি পছন্দ করেন। এজন্য অতীত ইতিহাসের বৃত্তান্ত ও প্রেক্ষাপট তাঁদের রচনার উপাদান হিশেবে গুরুত্ব পায়।

M. H. Abrams লিখেছেন—

“The Prose romance, ... has as Precursors the chivalric romance of the middle ages and the gothic novel of the later eighteenth century ... it tends to be set in the historical past, and the atmosphere is such as to suspend the reader’s expectations based on everyday experience. The plot of the prose romance emphasizes adventure, and is frequently cast in the form of the quest for an ideal....” (A glossary of Literary Tems Harcourt College Publishers, Indian reprint 2001, p. 192)

এই রোমাঞ্চ লেখাই লেখকের লক্ষ্য। তিনি এজন্য একটা আদর্শের সন্ধানে তাঁর নায়ককে প্রেরণ করেন। অনেক সময় সে শক্তির বিরুদ্ধে যাত্রা করে। বহু রোমাঞ্চকর এবং অসন্তোষ ঘটনার অবতারণা করে লেখক কাহিনি রস জমিয়ে তোলেন। নায়কের মনের ‘primal desires’, ‘hopes’, ‘terrors’—রোমাঞ্চ লেখকের লেখায় ফুটে ওঠে। শরদিন্দু এই রোমাঞ্চ রস ঘনীভূত করে তোলার জন্যই রহস্যময় অনুকারাচ্ছন্ন অতীতের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণেই বারবার তিনি ইতিহাসের এক একটা সন্ধিকালকে অবলম্বন করেছেন। এই সন্ধিকালগুলি ইতিহাসে ঘটনাপূর্ণ, কাজেই মানুষের মনের কল্পনাকে সহজে উদ্বেজিত করে তুলতে পারে। সেগুলির অন্ধকারপূর্ণ প্রেক্ষাপটও মেলোড্রামাটিক ঘটনাবর্ত সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী। শরদিন্দু এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘটনাবলি প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে তাঁর নিজের অধীত বিদ্যা, সৃষ্টিশীল কল্পনা এবং শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ তৎসম ভাষাকোষ ব্যবহার করেছেন। এইভাবে অতীত ইতিহাসের একটি ভাবময় রূপ ও তাঁর

লেখায় গড়ে উঠেছে। ইতিহাসকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন—তাতে ইতিহাসের কী রূপ ফুটে উঠেছে—সম্ভব-অসম্ভব কাহিনির সমাবেশে ইতিহাসের এই গড়ে ওঠা রূপের প্রতিটি আমাদের লক্ষ্য।

‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের বিষয় হুণ অধিকৃত এক রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে সেই রাজ্যের মৃত রাজার অপরিচিত পুত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎ প্রণয় ও বিবাহ। মধুরাস্তিক রোমাঞ্চ রসসিক্ত এই কাহিনির মধ্যে ইতিহাসের কোনো সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। লেখক নিজেই বলেছেন কাহিনি সম্পূর্ণতই কল্পিত, এবং স্বন্দগুপ্তের নাম ছাড়া এতে ইতিহাসের কোনো স্পর্শ নাই। “আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্বন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক” (ভূমিকা) স্বন্দগুপ্ত সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে, প্রথমে কাল্পনিক আখ্যায়িকার কথা বলি।

কাহিনি হুণ রাজ্য ‘বিটক্ষ’ দেশকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ‘বিটক্ষ’ দেশ সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো খবর পাওয়া যায় না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুসারে “প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হুণগণ একটি নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।” (ভূমিকা উদ্বৃত্ত) যে রাজ্যের প্রাচীন নাম শরদিন্দু দিয়েছেন বিটক্ষ। বিটক্ষ রাজ্যের এক প্রপায় এ কাহিনির আরম্ভ। ‘প্রপা’ শব্দটি প্রাচীন। ঝাঁথেদে এর ব্যবহার আছে। মনুসংহিতায় আছে। পথের পাশে জলসত্রগুলির তত্ত্ববধানের দায়িত্ব সাধারণ নারীদের উপর ন্যস্ত থাকত। ‘প্রপাপালিকা’ নামটি তারই পরিচায়ক। এই পথ পার্শ্বের জল সত্রগুলি ভারতবর্ষের একটি কল্যাণমূলক আদর্শের পরিচয় দেয়। কত প্রাচীন তার ব্যবহার ঝাঁথেদের উল্লেখ থেকে তা কিছুটা বোঝা যায়। এই প্রপায় পালিকা সুগোপার কাছে হুণ বৃন্দ মোঙ্গের বিলাপ দিয়ে কাহিনির শুরু। এই হুণ যোদ্ধা মোঙ্গ পঁচিশ বছর আগেকার হুণ আক্রমণের স্মৃতি কঙ্গয়ন করতে ভাল বাসত। তাই সুযোগ পেলেই সে গল্প করতো। সুগোপাকে সেই গল্প শোনাতে গিয়ে সে হুণদের অতীত, তাদের বিক্রম, রাজপুরী আক্রমণ, নিষ্ঠুরতা—এসব কাহিনি বলে যাচ্ছিল। লেখক তার মুখ দিয়ে এই গল্প বলিয়ে হুণদের এই রাজ্যস্থাপনের অতীত আখ্যান পাঠকদের জানিয়েছেন। এ কাহিনি কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই পঁচিশ বছর আগের কথা বলবার জন্য মোঙ্গের মতো বৃন্দ যোদ্ধার স্মৃতি চারণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই স্মৃতি কথা গল্পের পক্ষে খুব দরকারী। মোঙ্গের কথা থেকে জানা যায়—

১. এই রাজ্যের বর্তমান রাজা একদিন এদেশের বীষ্ণুন রাজার মাথা কেটে শূল শীর্ঘে স্থাপন করেছিলেন

২. এ রাজ্যের ক্ষুদ্র বালক রাজপুত্রের দেহ নিয়ে হুণ যোদ্ধারা মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করছিল

৩. চু ফাঙ সেই ক্ষত-বিক্ষত রাজপুত্রকে নিয়ে যায়
৪. রাজকোষের লুঁঠিত অর্থ এ রাজ্যের রাজাকে উপহার দিয়ে তুষ্ফান চট্টন দুর্গের অধিপতি হয়
৫. রাজপুত্রের ধাত্রী এবং সুগোপার মা একই ব্যক্তি এ কথা শোনা যায়। কিন্তু তার কোনো খোঁজ মেলেনি।
৬. তুণ্ডের অধিপতি বর্তমান রাজা রোট্রাধর্মাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন  
 এই কথাগুলি এ গল্পের আদি কথা; গল্পের exposition-এর পূর্বকথা। এ হল আদি কথার আদি কথা। একথাগুলির পিঠৈই পরের গল্প গড়ে উঠবে। আদি কথার ও আগের কথা কীভাবে বলতে হবে লেখকেরা নানাভাবে তার কৌশল আবিষ্কার করেন। শরদিন্দু এখানে সময়ক্রমে গল্প বলে চলেছেন। তাই মোড়ের গল্পের অবতারণা। এই অতীত কাহিনির পটভূমিতেই নৃতন কাহিনির প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই উপন্যাসের নায়ক চিত্রককে আনা হয়েছে। এবং এই পরিচ্ছেদেই উপন্যাসের নায়িকাকেও এনেছেন লেখক। সুগোপা দুই চরিত্রের যোজক; পরে স্পষ্ট হবে সুগোপা বর্তমান রাজকন্যার বন্ধু এবং আগেকার রাজপুত্রের ধাত্রীকন্যা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই অতি কল্পনার শুরু— রোমান্সের অতিরিক্তের সূত্রপাত। রাজকন্যার স্থীর সঙ্গে চিত্রকের প্রগলভ আলাপের বাড়াবাড়ির মুখেই ছদ্মবেশী রাজকন্যার প্রবেশ এবং চিত্রকের ঘোড়াচুরি করে পালানো। এই পরিচ্ছেদেই লেখক পরিচয় উদ্ঘাটক চিত্রকের ললাট-তিলকের জন্ম চিহ্নের কথা জানিয়ে ছিলেন। গল্পের পক্ষে এ সবের প্রয়োজন আছে—ইতিহাসের দিক থেকে নয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্কন্দগুপ্তের কথা এসেছে—এবং তার সঙ্গে তুণ্ড রাজ্য বিটককে জোড়া হয়েছে। স্কন্দের কথা পরে বলা হবে—আপাতও কাহিনি প্রসঙ্গে বলি। চিত্রক রাজকুমারীর অশ্বচোর—তাকে মদিরা গৃহে খুঁজে পায় সুগোপা। বিটক রাজ্যের রাজধানী কপোতকুটে নিশ্চয় মদিরাগৃহের সংখ্যা গণনাতীত ছিল না; সুগোপা তার মালাকরকে খুঁজতে গিয়ে চিত্রককে খুঁজে পায়। যামিক প্রহরীরা তাকে সুগোপার নির্দেশ মতো তোরণ রক্ষীর জিম্মায় রাখে। আর এই এক রাত্রির মধ্যেই আকস্মিক ভাবে রাজপুরীর গুপ্ত সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হয়। সেই সুড়ঙ্গের কৃটকক্ষে রাতের মতো চিত্রকের স্থান জোটে, আর তাতেই পঁচিশ বছরের বন্দিনী পৃথার (সুগোপার মা) সন্ধান মেলে। এই সব অতি কাল্পনিক ঘটনা বিন্যাসের জাল বিস্তার করে লেখক সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টের সব সীমা ছাপিয়ে গেছেন। লেখক অসন্তুষ্ট ও আকস্মিকের, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সব স্তর উল্লম্ফনশীল কল্পনার বেগে অতিক্রম করে গেছেন। এই ভাবে অতিদ্রুত প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে অতীত কাহিনি থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিক্রমা করে লেখক নায়ক চিত্রক বর্মাকে নায়িকার কাছাকাছি এনে ফেলেছেন। সুগোপার মা পৃথার সন্ধান পাওয়া গচ্ছে। পৃথার উদ্ধারের ওপর অষ্টম পরিচ্ছেদে রাত্রে রাজপুরীতে গুহের

সঙ্গে চিত্রকবর্মীর দৃন্দ যুদ্ধ এবং গুহের মৃত্যু আরও একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। এ উপন্যাসে তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক হৃণ প্রধান ধর্মাদিত্যের সমক্ষে দু-একটি খবর দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ধারাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরই কন্যা বর্তমান গল্লের নায়িকা রংটা যশোধরা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে জানিয়েছেন চট্টন দুর্গের অধিপতির মৃত্যুর পর তার পুত্র কিরাত সে দুর্গের অধিপতি হয়ে বসেছে। সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু রাজকন্যা তাতে রাজি নয়। রাজা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অহিংসার উপাসক হয়েছেন। তিনি চট্টন দুর্গে চৈনিক অর্হৎদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। কিরাত তাঁকে ছলনা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

চিত্রক রাজা স্বন্দগুপ্তের দৃতের পত্র কেড়ে নিয়ে রাজমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। কিন্তু রাজমন্ত্রী চতুর ভট্ট তাকে বিশ্বাস করেননি। তাকে রাজাপুরীতে একপ্রকার নজরবন্দী রেখেছেন। এই নৈকট্যকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলবার অভিধায়ে রোমাসের ডানায় ভর করে লেখক চিত্রক ও রংটাকে একই সঙ্গে চট্টন দুর্গে রাজার কাছে নিয়ে চলেছেন। সে যাত্রার নাম দিয়েছেন বন্ধনহীন গ্রাণ্ডি। চিত্রক ও রংটা যশোধরার এই অশ্঵পৃষ্ঠে যাত্রার চিত্র বাংলা সিনেমার পথ শেষ না হবার নীতি মাধুর্যে পূর্ণ। তার উপর যাত্রা পথে পাঞ্চালায় উভয়ের অবস্থান ও রাত্রিযাপন, চিত্রকে রাত্রে রাজকুমারীর দ্বার রক্ষা সমস্তই মাধুর্য ও প্রণয়পূর্ণ। গল্লে এই যাত্রার বর্ণনা রোমাসের পক্ষীরাজের ডানায় ভর করে উড়ে চলা। চট্টন দুর্গ থেকে আসা চৈনিক পরিব্রাজকের মুখে রাজা ধর্মাদিত্যের প্রায় বন্দীত্বের সংবাদ শুনে চিত্রক ও যশোধরা স্বন্দগুপ্তের সাহায্য প্রার্থী হতে যাত্রা করেছে। যাত্রাপথের বর্ণনা দুঃখদায়ক না হয়ে হয়েছে আনন্দপূর্ণ। এমনকি রাজকুমারী হৃণ রাজকন্যাকে পক্ষীরাজের অশেষ ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করে পর্বতগুহায় রাত্রিযাপন করেছেন। আর এই যাত্রা, রাজকুমারী ও চিত্রকের নৈকট্য, নিবিড় বিশ্বাস বোধ একই পাঞ্চালায় চিত্রকের রাত্রি জেগে রাজকন্যাকে পাহারা দেওয়া, তা জানতে পেরে রাজকুমারীর পরিত্থিপ্রতি এসবই নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ পর্যায়। এরপর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে বন্যপশুর জুলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে জীবন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে চিত্রকের যে দায়িত্ববোধ—তা থেকেই বলা হয়ে যায়। প্রস্তাব আসে রাজকন্যার দিক থেকেই কারণ রাজকন্যাই এখানে মর্যাদার দিক থেকে উত্তরণ।

‘অস্ফুট কঠে রংটা বলিলেন—রাজকুমারী নয়, বলো রংটা

কিছুক্ষণ স্তৰ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকঠে বলিল—রংটা

বলো রংটা যশোধরা

রংটা যশোধরা।’’

আরেক দিক থেকে শরদিন্দু বক্ষিমচন্দ্রের রোমাঞ্চগুলির উত্তরসূরী। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসের

গতির কথা বলেছিলেন। নির্মলকুমারী যখন মানিকলালের ঘোড়ায় চড়ে বলে তখন বক্ষিম কোনো কৈফিয়ৎ দেননি। বরং পাঠককে কিঞ্চিৎ লঘু বিদ্বৃপ করেছিলেন। শরদিন্দু এমনই বেগে কাহিনি চালনা করেছেন যাতে তার রোমান্স রসের টানে গল্পের পাঠক এগিয়ে চলে। শরদিন্দু কালের মন্দিরা কাহিনিতে কোনো সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টবের সীমারেখা টানেনি। স্বন্ধাবারে নারীর প্রবেশ যে কীরকম অসন্তুষ্ট তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। বরং স্বন্দ রাজকুমারীকে দেখে মুঢ় হয়েছে। আর্য না হৃণ এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। রটাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—“ তোমাকে জীবন সঙ্গনী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।”<sup>১</sup> চিত্রকের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে রটা এ প্রস্তাব স্বীকার করে নি। “রাজাধিরাজ, ... মার্জনা করুন। হৃদয় দিবার অধিকার আমার নাই।”<sup>২</sup>

রোমান্স রসের প্রয়োজনীয় ‘প্রথম দর্শনে প্রেম’, পুরুষের চিত্তে নারীর রূপাসক্তি, প্রণয়ে ব্যর্থতা, এসব কিছুর আয়োজন কাহিনিতে উপস্থিত। তার সঙ্গে আছে চিত্রকের প্রতি রটার প্রণয়বোধের একনিষ্ঠতা। স্বন্দ এখানে প্রতি নায়কা প্রতি নায়ককে ছেড়ে নায়কের প্রতি মনোনিবেশ, পাঠক মাত্রেরই মনে স্বষ্টি আনে। রোমান্সের ধর্মই তাই। স্বার্থ থেকে স্বার্থোধ্ব চরিত্র রচনা রোমান্স রসকে ঘনীভূত করে। এরপর কাহিনির আর অতি অল্পই বাকি থাকে। চট্টন দুর্গে স্বন্দের সৈন্য ও রণহস্তী চট্টন দুর্গে পৌঁছে যায়। সেখানে ও কাহিনিতে ঈষৎ জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা; কিরাতের দূত চট্টন দুর্গের দুর্গপাল মরং সিংহ হৃণ শিবিরে সাহায্য চাইতে যাবার পথে ধরা পড়ে। তার ঘোড়ার কাপেট দিয়ে মোড়া, তাই ‘অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বের হয়না।’ কিরাতের দূতের উপর দৈহিক পীড়ন চালিয়ে কিরাতের মনোভাব বোঝা যায়। তার তরবারির কোষ থেকে হৃণ রাজের উদ্দেশ্যে লিখিত অগ্ররূপকের পত্র পাওয়া যায়। তাতে চট্টন দুর্গাধীশ কিরাতের উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

এরপর কাহিনির আর কিছু আবশ্যিক থাকে না। ধর্মাদিত্য বিটক্ষ রাজ্য ছেড়ে সংঘে আশ্রয় নেবার সংকল্প জানান। বিটক্ষ রাজ্যের উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়। চিত্রক ও রোটাধর্মাদিত্যের বিয়েতে কাহিনি শেষ হয়। কিন্তু শেষের পরেও একটা পরিশিষ্ট থাকে। সেখানে রোটা ও চিত্রকের বিয়ের আনন্দ নিয়ে রাজ্যের প্রজাদের উচ্ছলিত সুখের মধ্যে একটি কথা বলা হয়েছে। রাজকন্যা রোটা যশোধরা সুগোপার কাছে আগেই চিত্রকের পরিচয় জেনে গিয়ে ছিলেন। তারপর সমস্তটাই জ্ঞাতসারে ঘটানো। রটা বলেছে চিত্রকের পরিচয় জেনে সে তার কর্তব্য ঠিক করে নেয়।

‘মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নাচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলেনা। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।’<sup>৩</sup>

সমস্ত গল্পটার মধ্যে রোমান্সের যে কঙ্গলোক রচনা হয়েছে তা পাঠকের আগ্রহকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে। উপসংহারে নায়ক নায়িকার মিলনে সে রোমান্সের পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। কিন্তু উপন্যাসের কোনো চরিত্রই ইতিহাসের নয় “কেবল স্বন্দণপ্রের চরিত্র ঐতিহাসিক।” এখন প্রশ্ন ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক কতটা ইতিহাসের মেজাজ ধরে রাখতে পেরেছেন?

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য নয় ইতিহাসের রস চাই। যেমন মসলা আস্ত থাকুক বা বেটে ঘেঁটে একাকার করা হোক ব্যঙ্গনের স্বাদ চাই, তেমনি ইতিহাসের তথ্য আস্ত থাকুক বা নাই থাকুক ইতিহাসের আস্বাদ চাই। শরদিন্দু একথাটা খুব ভাল জানতেন। তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল দুটি। এক তীব্র কঙ্গনা শক্তি এবং কঙ্গনাকে সাকার করবার রচনাশক্তি। রচনা শক্তি বলতে যা বোঝায় তার প্রায় সবই শরদিন্দুর ছিল। ফলে অতীত অঙ্ককারের গভর্গৃহ থেকে একটি আস্ত যুগ পরিবেশ সমেত সেই যুগের পাত্র পাত্রীদের সাকার করে দেখাতে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। এ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বেশি নয়, কারো কারো ভূমিকা অত্যন্ত কম। চিত্রক এবং রট্টা যশোধরা প্রধান দুই পাত্রপাত্রী। এদের জীবনকে অবলম্বন করে একটা রোমান্স ঘনিয়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে আর একটি বৃহত্তর মানবিক বার্তা দেওয়া এই দুই কাজ তিনি ভালভাবেই করেছেন।

চিত্রক এ উপন্যাসের নায়ক। তার দুর্ভাগ্যময় অতীত (শৈশব) থেকে সৌভাগ্যময় বর্তমানে প্রতিষ্ঠা এ কাহিনির বিষয়। চিত্রক তার অজ্ঞাত পরিচয় জীবনে একটা পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। সে রাজপুত্র। পঁচিশ বছর আগে হৃণ আক্রমণে তার পিতামাতা নিহত হয়। তার পালিকা মাতা নিরংদিষ্ট। হৃণ সৈন্যদের তরবারিতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষিত। তাকে হৃণ চু-ফাঙ্গ রক্তকর্দম থেকে তুলে ঝুলিতে ভরে নিয়ে যায়। কেন সে তাকে রক্ষা করে তার কারণ জানা যায় না। তারপর শৈশব কৈশোর অতিক্রান্ত চিত্রক যুদ্ধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে আত্মরক্ষা করে। নিজের জীবন নিজের হাতে তাকে গড়ে নিতে হয়েছে বলে, যুদ্ধ করে তাকে ঢিকে থাকতে হয়েছে বলে সে স্বীয় কর্মে পটু, বিদ্যার চেয়ে তার বুদ্ধির প্রাথর্য বেশি; বিপদের মধ্যে বুদ্ধি স্থির রাখা তার স্বভাবসিদ্ধ। সে চতুর, স্বার্থসিদ্ধি পরায়ণ, উপস্থিতি প্রয়োজনের দিকে তার ঝোঁক; জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দোলাচল অবস্থায় সে আত্ম চিন্তা করে। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও শক্তি দুইই তার যথেষ্ট। চিত্রককে সৈনিক শ্রেণির চরিত্র রূপে গড়ে তুলে সে কালের ধর্ম তার উপর আরোপ করাতে লেখক সিদ্ধ কাম হয়েছেন। গুপ্ত যুগের মানুষের আচার ব্যবহার রীতি-প্রথার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। চিত্রকের ব্যবহারে তেমন কোনো কালৌচিত্যের অভাব দেখা যায় না। তবে তরবারির উপর শিশু রাজপুত্রকে নিয়ে

গোফালুফির পরও তার বেঁচে যাওয়া একটু বেশি বিশ্বাসের উপরে আঘাত দেয়। তারপর অপরিচিত পরদেশি (যে ঘোড়া চুরি করে ধরা পড়ে) তার সঙ্গে রাজন্যকে পাঠানো- রোমাসের অতিরিক্ত।

চিত্রকের শশিশেখরের সঙ্গে কথোপকথন বা আচরণের মধ্যে যে প্রগল্ভতা তা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করে রাজ অবরোধে কঞ্চুকী লক্ষ্মণের নজর বন্দী হয়ে থাকার সময় সে তার পরিচয় জানতে পারে। এরপর সে প্রতিশোধ স্পৃহায় চঞ্চল হয়। রাজকুমারীও তার পরিচয় জেনে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দেন। চিত্রকের মনে এই সময় থেকে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিনে স্বাভাবিক প্রতিশোধ প্রবণতা অন্যদিকে রাজকুমারীর প্রতি আকর্ষণ এই দুয়ের দ্বন্দ্বে চিত্রক একটা যুক্তি খুঁজে পায়। রাজকুমারী তো তার প্রতি কোনো অন্যায় করেননি কাজেই তার উপর প্রতিশোধ নেবার মানে নেই। রাজার উপর প্রতিশোধ নেওয়াই তার লক্ষ্য হয়। রাজকুমারীর প্রতি তার চাপা অনুচ্ছসিত প্রেম তার সেবা ও সাহচর্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। বিপদের মধ্যে ধৈর্য রক্ষা উদ্বারের পথ খুঁজে নেওয়া এসব কাজে তার স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রকের প্রতি রাজকুমারীর আকর্ষণ কৌতুহল থেকে তৈরি হয়ে প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর দৃঢ় হয়। সন্তুষ্ট চিত্রকের আকার ও প্রকারের মধ্যে রাজকুমারী একজন পুরুষের পরিচয় পেয়েছিলেন। তার পরিচয় সুগোপার মুখ থেকে শোনার পর রাজকুমারীর মন কীভাবে তাকে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিতে প্রস্তুত হল সে ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে। আরো প্রশ্ন রাজ অবরোধের মধ্যে নারীর যে সংকীর্ণ স্বাধীনতা তা কীভাবে রাজকন্যা এড়িয়ে গিয়ে চিত্রকের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় একালের প্রেমিক প্রেমিকার মতো কথোপকথন করলেন। লেখকের দিক থেকে একটা কৈফিয়ৎ আছে। সেটাই তাঁর প্রধান যুক্তি। রট্টা হৃণ কন্যা, অবরোধ প্রথা যদিও এদেশে চালু হয়েছে তবু তা ততো কঠোর নয়। দ্বিতীয় যুক্তি রাজ্যে রাজা নেই, রাজার প্রতিনিধি হিশেবে রাজকন্যা অনেকটাই স্বাধীন। তৃতীয় যুক্তি রাজকন্যা পিতার অনুসরণে বুদ্ধের স্মরণ গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর মধ্যে ঈর্ষা বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নেই। চিত্রক রাজকুমারীর উপর প্রতিশোধ নিল না—তাই রট্টা ভালোবাসার দ্বারা তাঁর প্রতিদান দিয়েছে।

রট্টার মধ্যেই লেখকের মনোভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। রট্টা হৃণ কন্যা। কিন্তু তার মা আর্য। তার মধ্যে আর্য ও হৃণ রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। রট্টার বাবা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। হৃণদের জীবনের হিস্ত পরিহার করে অহিংসা ধর্ম নিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছদে মোঝের কথা দিয়েই হৃণদের অতীত জীবনের সঙ্গে বিটক্ষ রাজ্যের বর্তমান অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। মোঝের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন হৃণ জাতি ভেড়া হয়ে গেছে। রাজার সম্বন্ধে তার শ্লেষোক্তি ‘তরবারি

যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈত্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে।”<sup>৫</sup>  
এই কথার মধ্যে রাজ্যের রাজার ও দেশের পরিস্থিতি বোঝানো হয়েছে। রটাকে চিত্রক প্রশ্ন করে  
“আপনি হৃণদুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হৃণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে।”

রটা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেছে—

“আর্য!—হৃণ! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হৃণ। আমি তবে কোন জাতি? জানিনা। সম্ভবত  
মনুষ্য জাতি।”

আর পক্ষপাতের প্রসঙ্গে উত্তর দিয়েছে—

“এই আর্য ভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ  
তাহাদের ছাড়া অন্য মানুষ আমি দেখি নাই।”<sup>৬</sup>

রটার মুখ দিয়ে এই ভাবে লেখক উদার মানবতার আদর্শ প্রচার করেছেন। এ কাহিনির ভূমিকায়  
তিনি বলেছিলেন—

“গঙ্গা বলা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্ত করা যাইতে  
পারে—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন  
শক হৃণ দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।”

ভারতবর্ষে বহু মানুষ বাইরে থেকে এসেছে। তারা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাধীন অস্তিত্ব  
হারিয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। যারা এই নিয়মকে স্বীকার করতে চায় না তাদের সম্বন্ধে  
লেখকের বক্তব্য—

‘যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম  
লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে তাহারা শুধু বিচার মৃত্য নয়—মিথ্যাচারী।’

ভারতবর্ষের অঙ্গহানি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পারস্পরিক অবিশ্বাসের দিনে শরদিন্দু এই উপন্যাস  
লিখে মানুষকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত আজকের পরিস্থিতিতেও এই বার্তা যথেষ্ট  
উপযোগী।

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রক বা রটা কিংবা ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের  
গঙ্গা মাত্র। বিটক নামের কোনো রাজ্য ছিল বলে জানা যায় না। তবে একথা ঠিক হৃণদের একটা  
অংশ পাঞ্জাব ও আরও পশ্চিমে কোথাও কোনো ছোট রাজ্য থেকে গিয়েছিল। ইতিহাসের এই  
সংকেতটুকু নিয়েই কাহিনির ডালপালা ছড়ানো হয়েছে। লেখক সভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা  
মনে রেখেই কাহিনি নির্মাণ করেছেন। বাস্তবের হৃণ কন্যার মধ্যে এই অহিংসাধর্ম, হৃণ রাজ্যের

রাজকন্যার পক্ষে এই উদার আদর্শবোধ অবলম্বন করার সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানেই ইতিহাসের চেয়ে কবি কঙ্গনার সত্ত্যের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ।

স্কন্দগুপ্ত ইতিহাসের চরিত্র। স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস লেখক অনুসরণ করেছেন। কুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হন। সমকালীন একটি অভিলেখ থেকে জানা যায় সে সময় শক্র আক্রমণে গুপ্ত বংশের রাজলক্ষ্মী বিচলিতা হয়েছিলেন। স্কন্দ শক্র জয় করে রাজলক্ষ্মীকে স্থির করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় রাজ্য নিয়ে স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে তাঁর ভাইদের বিবাদ হয়েছিল এবং “goddess of sovereignty of her own accord, selected him as her husband, having in succession discarded all other princess.”<sup>9</sup> স্কন্দগুপ্ত বেশিদিন শাস্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। তাঁর সময়েই পুষ্য মিত্রীয় এবং শ্বেত হুণদের আক্রমণে দেশের শাস্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। মোঙ্গের গল্প বলার মধ্যে হুণদের কথা এসেছে। বক্ষু নদীর তীরে তাদের দুর্মনীয় জীবন পিপাসার কথা মোঙ্গের কথা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন। বক্ষু নদীর উৎপত্তি আফগানিস্তানে। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এর অবস্থান। নদীর নাম লাতিনে Oxus। বৈদিকে বক্ষু। বর্তমানে এর নাম আমুদরিয়া। শরদিন্দু ‘বক্ষু’ নামটি ব্যবহার করেছেন। এই মধ্য এশিয়া থেকেই হুণরা হিন্দুকুশ পেরিয়ে গান্ধার রাজ্য দখন করে। কিন্তু ৫৬০ খ্রি. স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে আর এগোতে পারেনি। এরপর তারা পারস্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাসে তাদের ক্রুরতা এবং বর্বরতার কথা পাওয়া যায়।

শরদিন্দুর উপন্যাসে হুণদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ কেবল সাম্রাজ্য দখল করবার সময়কার কাহিনিতে পাওয়া যায়। রাজ্য জয়ের পর সব ক্ষেত্রেই অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। রাজপুত্রকে অস্ত্রের উপর লোফালুফি, ধনভাণ্ডার লুঠ, নারী হরণ এইরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে আছে তার পরবর্তীকালে হুণদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ বিটক রাজ্য নেই, কিন্তু ষড়যন্ত্র ও প্রতিশোধ বেরার বাসনা চন্টন দুর্গের অধিপতি কিরাতের বর্ণনায় আছে।

স্কন্দগুপ্তের কথা উপন্যাসে প্রধান নয়, গল্পে তিনি কেবল ইতিহাসের মেজাজ আনবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন। শরদিন্দু যতটা সম্ভব ইতিহাসের তথ্য কাহিনিতে ব্যবহার করেছেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকেই হুণ আক্রমণ হয়। রাজলক্ষ্মীকে স্থির করবার জন্য স্কন্দ হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। কাহিনি শুরুর সময় স্কন্দের বয়স পঞ্চাশ বছর। স্কন্দের দেহ বলদৃপ্ত, জরার চিহ্নীন। কিন্তু ইতিহাসের এই তথ্যগুলি গল্পের পটভূমি তৈরি করেছে মাত্র। এলাহবাদ লিপিতে হরিয়েগের প্রশংস্তি অনুসারে সমুদ্রগুপ্ত ‘কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ’ ছিলেন।

স্কন্দের সমকালীন একটি অভিলেখ-এ (Incription) তাঁর শত্রুদমন করার প্রশংসা আছে। তাঁর বীরত্বের কথা সারাদেশে কীর্তিত হত (This heroic achievement of Skanda gupta was sung in every region (Ibid, p. 25) কিন্তু তাঁর কবি ও ভাবুক চেহারার কথা শরদিন্দু নিশ্চয় কোনো ইতিহাস সূত্র থেকে পেয়েছেন। তিনি তাঁকে বীর অপেক্ষা ভাবুক শ্রেণির মানুষ হিশেবেই এঁকেছেন। স্কন্দের রাজনৈতিক গুণাবলী অপেক্ষা এই কোমলতা ভাবুকতা এবং আত্মবিস্মৃত কিংবা কখনো আত্মগত ভাবের পরিচয় উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে। লহরী বলেছে “মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী” বলেছে “তিনি সেবা লইতে জানেন না।” (৮৭) স্কন্দের ভাবুক চরিত্রের দুটি প্রকাশ। স্কন্দের বিমনা ভাব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিমনা ভাব দেখাতে পাশার দানের কথা বলা হয়েছে। রাজার ভাবনা হৃগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রকাশ পাশার দান। ‘স্কন্দ দুই হাতে পার্ষ্ণি ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন— পাশা বলিতেছে এবার হৃগকে তাড়াইতে পারিব না।’ (১৫) আবার যোড়শ পরিচ্ছেদে পাশাখেলায় রটার কাছে পরাজিত হয়ে পণ রক্ষা করতে চণ্টন দুর্গে গিয়েছেন। স্কন্দের আর একটি প্রকাশ তার প্রেমিক চরিত্র। স্কন্দ ভোগী নন—লহরী বলেছে ভোগে তাঁর রুচি নেই কিন্তু রটা যশোধরাকে তাঁর জীবন সঙ্গিনী করবার বাসনা হয়েছে। ভোগে আসক্তি থাকলে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন না আবার রটার প্রত্যাখ্যানও সহ্য করতেন না। কেবল রটাকে বলেছেন “আমাকে ভুলিও না, ... আমাকে মনে রাখিও।”<sup>৮</sup> স্কন্দ চরিত্র রচনায় শরদিন্দু কালিদাসের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত কিন্তু নিজের স্বভাব বর্জিত নয়। স্কন্দকে তিনি দুষ্যন্তের মতো আদিরসের নায়ক করে গড়েননি। লুকাচ ওয়াণ্টার স্কটের লেখায় যে লক্ষ করেছিলেন স্কন্দের চরিত্রে সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শরদিন্দু দেখাতে পেরেছেন। পিপলী মিশ্রের মতো স্তুল বিদ্যুকেরা যেভাবে রাজার মনোরঞ্জন করতেন তাতে রাজা ও রাজসভাসদদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পিপলী মিশ্র কালিদাসের বিদ্যুক চরিত্রের আদলে গড়া। তা আসলে বিদ্যুক চরিত্রের প্রথা অনুসরণ স্কন্দ চরিত্রটি ঐতিহাসিক; কিন্তু ইতিহাসের চেয়ে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার জীবনের করে লেখা। নিয়ন্ত্রক বেশি। স্কন্দের হস্তক্ষেপেই উপন্যাস অংশে চিত্রিক কিরাতের হাত থেকে রাজা ধর্মাদিত্যকে মুক্ত করেছেন। রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ করেছেন। এগুলির কোনোটাই ইতিহাসকে প্রভাবিত করেনি। স্কন্দের উপস্থিতি সন্ত্রে উপন্যাসের ঐতিহাসিক মহিমা বৃদ্ধি লাভ করেনি। বরং একথা বলা যেতে পারে স্কন্দ ইতিহাসের যে পর্বে হৃগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত আছেন সেই সময়কার হৃণ অধিকৃত একটি রাজ্যের সম্ভাব্য চিত্র—এ উপন্যাসে লেখক এঁকেছেন।

কিন্তু চরিত্র নয় কাহিনি রচনাই এ উপন্যাসের মূল কথা। কাহিনির মধ্যেই ইতিহাসের অতীতকে তিনি জীবন্ত করে গড়ে তুলেছেন। চরিত্র এবং কাহিনির মধ্যে লুকাস ইতিহাসের সারসম্মতা

(Sense of history) খুঁজেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখেছেন অনেক লেখকই তাঁদের সমকালীন বাস্তবতাকে এখানে ওখানে ইতিহাসের ঘটনা মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। শরদিন্দুর কাছে ইতিহাসের উপাদান প্রায় কিছুই ছিল না কেবল একটি দুটি ধারণা ছিল। তাই দিয়ে উপন্যাসের মায়ালোক এবং ইতিহাসের অতীত লোক গড়ে তুলেছেন।

‘কালের মন্দিরার’ শুরু হচ্ছে কপোতকুট থেকে কিছু দূরে (দু দণ্ডের পথ) প্রপাপালিকার ফুটিরে। প্রপাপালিকার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বৃন্দ হৃণ মোঙ পঁচিশ বছর আগেকার হৃণ আক্রমণের কাহিনি বিবৃত করেছে। মোঙের গল্প উপন্যাসে অতীত বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে কাহিনির সূচনা করেছে। এতে গল্পের কালগত সংহতি এবং ত্রিয়াগত সংহতি রক্ষা হয়েছে। এভাবে অতীত কথা না বললে গল্প পাঠকের পক্ষে সেই ধরা সম্ভব হত না। গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদেই অতীত কথার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বর্তমানের প্রধান দুটি চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন এবং একটা Conflict তৈরি করেছেন। প্রপাপালিকা সুগোপা এই দুই চরিত্রের মধ্যবর্তী, মোঙ পশ্চাত্পত্তি রচনাকারী। রাজপুত্রী রট্টা পুরুষবেশে সুগোপার জলসত্ত্বে এসে পড়েছেন।

মোঙ চিত্রক কথালাপের মধ্যে চিত্রকের পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। সুগোপার সঙ্গে তার চটুল রহস্যলাপে তার যে প্রকৃতি পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় পরে গল্পের মধ্যে তার সমর্থন নেই। চিত্রককে আর কথনো কোনো রমণীর প্রতি এরকম আচরণ করতে দেখা যায় না। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও কাহিনির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ চিত্রকেরা এই ধৃষ্টতার প্রেক্ষিতেই আকস্মিক ভাবে তার জন্মগত প্রকৃতির একটি দিক উদ্ঘাটিত করে দেখানো হয়েছে। সুগোপার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গভীর উন্নেজনার মধ্যে চিত্রকের ললাটের চিহ্ন জুলে উঠেছে। “সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল চিত্রকের দুই চক্ষু হীরক খণ্ডের মত জুলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তান্ত্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে।”<sup>৯</sup> সুগোপা চিত্রকের রক্ত তিলক দেখে স্তুতি হয়েছে। এই ললাট চিহ্ন পাঠককে জানানো দরকার ছিল। অ্যারিস্টটলীয় উদ্ঘাটনের প্রক্রিয়ার জন্য এই চিহ্নটি কাজে লেগেছে। দ্বিতীয়ত নিঃসঙ্গ সুগোপার সত্রাস দৃষ্টি তার নিরূপায় অবস্থা বুঝিয়ে দেয়; স্তুতি অবস্থা বুঝিয়ে দেয় চিত্রকের ললাট তিলকের ...। আর এই পরিস্থিতিতেই নাট্য চমক সৃষ্টি করে প্রবেশ করেছে কিশোর অশ্বারোহী। কিশোর অশ্বারোহীর “সুগোপা” ডাক সুগোপাকে যেমন স্বষ্টি দিয়েছে তেমনি চিত্রককে পথ ছেড়ে সরে যেতে বাধ্য করেছে। কাহিনির দিক থেকে এই চমক প্রয়োজন ছিল। রাজকুমারীর এই আকস্মিক আগমন চিত্রককে যেমন বিমুক্ত করে তেমনি সুগোপাকে স্বষ্টি দেয়—পাঠকেও চমক দিয়ে জাগিয়ে তোলে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অশ্বারোহীর প্রশ্নের উত্তরে সুগোপা—বলেছে “ঐ বিদেশী গ্রামীণটা প্রগল্ভতা করিয়াছিল মাত্র”<sup>১০</sup> কিন্তু কেউ

এর প্রতিকার চায়নি। অশ্বারোহী তরঙ্গ চিত্রকে অশ্঵রক্ষা করতে বলেছে। আর এই পরিস্থিতিতেই চিত্রকে ললাট চিহ্ন আবার আরক্ষ হয়ে উঠেছে। সে অশ্ব চুরি করে পালিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইভাবে কাহিনি-কার কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধন করেছেন

১. চিত্রকের সঙ্গে সুগোপাকে কেন্দ্রে রেখে কিশোর রাজকুমারীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত পটভূমিতে—গল্লের প্রকৃত সূত্রপাত হয়েছে।

২. এই পরিচ্ছেদে নবাগত বিদেশি চিত্রক-সুগোপার সঙ্গে প্রগল্ভতায় এবং রাজকুমারীর অশ্বচুরি করে কাহিনিতে একটা Conflict তৈরি করেছে। এই Conflict থেকেই প্রাথমিক বিরোধের মধ্য দিয়ে চরিত্র দুটি পরিণতিতে মিলনের দিকে গেছে। এই ভাবে মোড়ের অতীত বর্ণনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক জীবনের নিরুত্তাপ অবস্থার মধ্যে একটা action দেখিয়ে লেখক কাহিনির মধ্যে যেমন একটা উত্তাপ তৈরি করেছেন তেমনি পাঠকের মনকেও জাগরুক করে তুলেছেন।

৩. চিত্রক এই কাহিনির নায়ক। তার অতীত উদ্ঘাটনের কোনো একটা উপায় চাই। সেই উপায় তার ললাট চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। পরে পৃথা এই চিহ্ন দেখেই তিলক বর্মা নামে তাকে শনাক্ত করতে পারবে। এইভাবে কাহিনিতে কয়েকটি দিক প্রথম দুটি পরিচ্ছেদেই উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। উদ্ঘাটনের এই রীতি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত নাটকে এবং প্রাচীন গ্রিক নাট্য সাহিত্যে বেশ প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম মগধের দূত। এই পরিচ্ছেদের দুটি অংশ; প্রথমটি পরবর্তীটির পটভূমি। আর যে চিত্রকবর্মা ক্রমশ কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে তার গুরুত্বের কারণও তো জানানো দরকার। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে রাজা ক্ষন্দের কথা; ইতিহাসের কথাই উপন্যাসিক নিজের ভাষায় তুলে দিয়েছেন যুবরাজ ক্ষন্দ যে বিদেশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিলেন সে কথা ইতিহাস সমর্থিত। এই খানে গল্লের প্রয়োজনে লেখক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য হুণ অধিকারের বর্ণনা দিয়ে গল্ল এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিটক দেশ হুণের অধিকার ভুক্ত হয়ে রইল। আর তারই আনুগত্য দাবি করে চিঠি নিয়ে যাবে রাজদূত। হুণ আক্রমণের সময় পাঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত সামন্ত রাজাদের কাছেই দূত পাঠানো হয়েছিল সমবেত প্রতিরোধের জন্য। ইতিহাসের সত্য। সেই সূত্রে কল্পিত বিটক রাজ্যও দূত পাঠানো সম্ভব। এটা ইতিহাসের তথ্য না হলেও ইতিহাসের বিচ্যুতি নয়। তারপর দেশে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ চলে তখন যে অস্ত্র শক্তির প্রাবল্য এবং চাতুর্যের জয় হয় তাও সত্য। কাহিনি অংশে এই ভাবে শশিশেখরকে প্রবর্ধিত করে তার সব কিছু চিত্রক কেড়ে নেয়। এই অংশটুকু অতি সরলীকৃত কিন্তু চিত্রকের পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য মগধরাজের পত্র এবং স্মারক দুটি খুব প্রয়োজনীয় ছিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিদ্যুক পিপুলের স্তুল রসিকতা এবং শশিশেখরের

অজ্ঞতা সত্ত্বেও শুধু এই কারণে অংশটির প্রয়োজন। নতুবা শশিশেখরকে প্রবণ্ধিত করে তার সর্বস্ব হরণ একটু বেশি কল্পনাশ্রয়ী।

মাঝখানের পরিচ্ছেদগুলি সবই ঐতিহাসিক রোমান্সের কাহিনি বিন্যাসের পরিচায়ক। রাজপুরীর মধ্যে চোর ধরার ক্ষেত্রে প্রথরী অপেক্ষা সুগোপার ভূমিকা চমকপ্রদ। চতুর চিত্রিক এই প্রথম এবং শেষবারের মতো বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে ধরা পড়েছেন। আসলে তাকে ধরাই উদ্দেশ্য—রাজপুরীতে আনানোই লক্ষ্য। এরপর চিত্রিক আত্মরক্ষার এবং প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেছে—তাতে এই অনায়াস জড়িমা নেই। অন্যদিকে রাজকুমারী রট্টার মধ্যে যেমন রোমান্সের নায়িকার মৃত্যি ফুটে উঠেছে তেমনি দিজেন্দ্রলাল রায়ের মেবার পতন নাটকের মানবপ্রেমী দেশপ্রেমী ও বিশ্বপ্রেমী চরিত্র—ছাপও পড়েছে। রট্টা লেখকের উদ্দেশ্যের বাহন। আর্য অনার্য মিলনের দৃতী।

আগেই বলা হয়েছে স্কন্দই এর ইতিহাসের ভিত্তি আর ইতিহাসের সন্তান্যতার দিক মনে রেখে এর কাহিনি গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটি কথা বলা দরকার। ইতিহাসে পাওয়া যায় স্কন্দ ৪৫৫ খ্রিঃ থেকে ৪৬৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ১২ বছর রাজত্ব করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্কন্দকে কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে করতেন। শরদিন্দুও তাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকের এ বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আর প্রথম পরিচ্ছেদে শরদিন্দু স্কন্দের ‘যোড়শ রাজ্যাঙ্কে’ কাহিনির পতন করেছেন কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তাঁর রাজত্ব কাল ১২/১৩ বছরের বেশি নয়। অবশ্য তাতে শরদিন্দুর কিছু করার ছিল না। তিনি রাখালদাসকে অনুসরণ করেছেন। আর এই রাজ্যকাল ব্যাপারটাও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়—কেননা কাহিনির বিষয় হুণ আক্রমণের পটভূমিতে একটি কল্পিত রোমান্সের পরিবেশন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন জাতিধর্মের মিশনের বাণী প্রচার। ইতিহাসের যে পর্ব ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসের বিষয়—তখন কোনো ভাবুকের পক্ষেই রট্টার মতো ভারত-ঐক্যের বাণী প্রচার—জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে মানব মহিমা ও ভারত মহিমার মন্ত্র প্রচার সন্তুষ্ট ছিল না। ইতিহাসের পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় কালৌচিত্য লঙ্ঘন—ইতিহাসকে এ কালের—বিংশ শতকের ভাব ধর্মে বিশিষ্ট করে তোলা।

ইতিহাসের পুনর্গঠন অর্থে সে কালের ইতিহাস কীরকম ছিল তার একটা সন্তান্য ছবি গড়ে তোলা। সেরকম ছবি গড়তে গেলে ইতিহাসের তথ্য যতটা দরকার লেখক তা পাননি। যেভাবে রট্টা যশোধরা বিদেশি দৃত চিত্রকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পাহুশালায় রাত কাটিয়েছেন— গুহাবাস করেছেন এবং স্কন্দের স্বাক্ষরারে পৌঁছেছেন তা সন্তান্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়। যদিও মধ্য যুগে নারীরা কোথাও কোথাও রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য শাসনে অংশ নিয়েছেন— কেউ কেউ যুদ্ধে গেছেন যুদ্ধ পরিচালনাও করেছেন কিন্তু সাধারণভাবে মেয়েরা এতটা স্বাধীনতা পেতেন

না। তাঁরা অভিভাবকদের রক্ষণা বেক্ষণেরই থাকতেন। এজন্য শরদিন্দু তাঁকে আর্য কন্যা না করে ‘হৃণ কন্যা’ হিশেবে দেখিয়েছেন। এবং তাঁর চরিত্রের কোমলতা ও চারুশীলতার সঙ্গে অশ্বারোহন দক্ষতা ও পথের বিপদ উত্তীর্ণ হ্বার মতো চারিত্র্য শক্তি ও যোজনা করেছেন। তবে যুগের যে গাঢ় অন্ধকারে হৃণ আক্রমণ পর্বের (পঞ্চম শতক) ভারত ইতিহাস আবৃত ছিল শরদিন্দু তাঁর সৃষ্টি চাতুর্যে, তাঁর কালের প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য সহযোগে, তাকে একটা নবরূপে একালের কাছে উপস্থিত করেছেন। একটি তথ্যে পাওয়া যায়—

“Women even sometimes took part in war - Akkadevi (sister of chalukya king Jaysimha II) fought battles ... Umadevi, queen of Hoysala King Virballala II led two campaigns ...”<sup>১১</sup>

শরদিন্দু দাসী রমণীদের প্রতিও সমান সহানুভূতিশীল ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে সুদর্শনা লহরী, ‘গৌড়মল্লারে’ কুণ্ড কোনো অংশে রাজ অন্তঃপুরনারীদের চেয়ে কম জান না। দাসী রমণীদের ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অসাধ্য সাধন, ষড়যন্ত্র, কাহিনির খাতিরে উচ্চস্থানে আসন দেওয়া ইত্যাদি গুণ সম্পর্কে কম লেখকই ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রী বিয়ের কথা মনে পড়ে। শরদিন্দুও সাবিত্রীকে পবিত্র বলেই মন্তব্য করেছেন। হয়তো ‘চরিত্রাদীন’ পড়ে শরদিন্দুর মনে দাসীদের সম্পর্কে একটা সদর্থক ধারণা জন্ম নিয়েছে। শরদিন্দুর মতে—

“চরিত্রাদীন” আজ শেষ হয়ে গেল। অনেকে বলে বইখানা রঞ্চি বিরুদ্ধ। যারা বলে তারা সাহিত্যিক নয়। এ বইয়ের প্রত্যেক পাতা ফুলের মত শুভ—অন্তের মত নির্মল! আমি এমন বই পড়িনি, যার সব চরিত্রগুলোই মহান, অভিভেদী, বৃহৎ। ‘চরিত্রাদীন’ একটা মহাকাব্য। দোষও আছে—কিন্তু দোষগুলো এতই তুচ্ছ—আমাদের মর্ম স্পৰ্শ করতে পারে না। এ যেন একটা উদার, স্বর্গীয় মহাসঙ্গীত। এর মধ্যে সমাজের সক্রীয়তা নেই—আবার বিচারের ক্ষুদ্র শুচিতা নেই—সবই যেন একটা বিরাট মহত্বের স্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে। মনে ভাবি, এ পৃথিবীটা যদি শরৎবাবুর কল্প-জগতের মত হত। সতীশের মত চরিত্রাদীনতা যদি কারও থাকে সে ধন্য; সাবিত্রীর মত ভট্টা যদি কেউ থাকে সে সার্থক; কিরণময়ী মত অপরাধিনীর অপরাধ যার সে মহান!”<sup>১২</sup>

অর্থাৎ নারীর প্রতি সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলিতেও। শরদিন্দু নিজেও তা দেখিয়েছেন। এছাড়াও রূপে গুণে সকল পুরুষের লোভনীয় করে রট্টা চরিত্রকে অক্ষণ করে বলেছেন তাতে কিরাতের দোষ কি? এতেও কিন্তু ক্ষন্দের সুপ্ত প্রেম বাসনার প্রকাশই ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, নারী পুরুষের মিলিত

সংসারই পারে শান্তি দিতে। তাই স্ফন্দ যখন শেষ বয়সের চিন্তায় মগ্ন থেকেছে তখন তাঁর মনে বিয়ের চিন্তা ঘুরে ঘুরে এসেছে। কারণ নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূর্ণতার প্রতীক। সুতরাং আলোচ্য উপন্যাসে পিঙ্গলী মিশ্র ও তার স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গ তুলে লেখক স্ফন্দের মনে বিবাহের স্বাদ জাগাতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে চিত্রকের মনে রট্টা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। সে ভেবেছে রমণীর মন কোমল ও তরল—অল্পতাপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কারণ স্ফন্দের ব্যক্তিত্ব, ঐশ্বর্য, শশাগরা ভারতবর্ষের সন্নাট অধীশ্বর ইত্যাদি দেখে হয়তো রাজকুমারী ভুলতে পারে। তার (চিত্রক) তো কিছু নেই। তাই সে মনে মনে চিন্তিত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের একজন বিরাট ব্যক্তিত্বকে কীভাবে প্রেমিক করে তুললেন, কী করে ভাবুক ও সাংসারিক করতে চাইলেন—সত্যিই সাধারণ পাঠক হিশেবে আমাদের কৌতুহল বাড়ায়। আর এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

চিত্রক কিন্তু সংশয়ের অবকাশ পায়। তদুপরি বন্ধু গুলিক বর্মার কথা তাকে আরো হতাশ করে তোলে। গুলিকের কথায় ধরা পড়ে নারী সম্পর্কে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। সে বলে নারী যতক্ষণ তোমার বাছ মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ তোমার, বাছ মুক্ত হলে আর কেউ নয়। অনেক দেশের নারী দেখলাম; সকলই সমান, কোনো ভেদ নেই। চিত্রকেরও তাই-ই অভিজ্ঞতা। আসলে শরদিন্দুর বাস্তব অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা তাঁরই সৃষ্টি এই গুলিক বর্মা। তাই স্বাভাবিকভাবে নারীর প্রতি আকর্ষণের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রকের মনে জেগে ওঠে পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা। মনে পড়ে যায় ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা।

শরদিন্দুর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গোড়মল্লার’। মল্লার রাত্রিকালীন রাগ হিশেবে পরিচিত। পটভূমিকায় লেখক উপন্যাসের পটভূমি হিশেবে গৌড়দেশকে নিয়েছেন, আর কাল হিশেবে নিয়েছেন রাজা শশাক্ষের মৃত্যুর পরবর্তী কুড়ি বছর। তিনি এই গ্রন্থে “এই সময়ে বাঙ্গলীর চরিত্র, সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন নাগরিক জীবন কিরণ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা” (পটভূমিকা) করেছেন। এই জন্য নীহারঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গলীর ইতিহাস’ এবং সুকুমার সেনের ‘প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গলী’র পুস্তিকা তাঁর প্রধান অবলম্বন। রাজবর্গের কথা এ উপন্যাসে প্রধান নয়—সাধারণ নরনারীর জীবন কথাই এর লক্ষ্য। ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসে তাঁর দ্রষ্টিতে ছিল ‘ভারততীর্থ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি—এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে শক হৃণ পাঠান মোগল মিলে মিশে গেছে। পাটান মোগল মিলেছে কিনা তা এ গল্পে বলা হয়নি। বলা হয়েছে আর্য ও হৃণ

জাতির মিলনের কথা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলনের কথা। ইতিহাসের তথ্য এখানে কম, লেখকের অভিপ্রায় ইতিহাসের ভিতরে সম্ভাবনার বীজ বগৎ করেছে। ইতিহাস অপেক্ষা লেখকের অভিপ্রায় এখানে বড়। ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে ইতিহাস অংশ ক্ষীণ; মানবজীবনের কাল্পনিক রূপ রচনা প্রধান। অভিপ্রায় এখানে ইতিহাসকে কৃষ্ণিত করেনি।

শশাঙ্ক বাঙালি রাজাগরের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। রোটাসগড় গিরিগাত্রে “শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক”<sup>১০</sup> নামটি ক্ষেত্রে আছে। এই সূত্রে অনুমান করা হয় তিনি যষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্ত সন্তাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত<sup>১১</sup> ছিলেন শশাঙ্ক একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল অনেক। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানবদের মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের মতো রাজনীতি জ্ঞান দূরদর্শিতা এবং কুটনৈতিক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। ফলে ভাস্তুরবর্মা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। তারপর জয়নাগ নামে একজন রাজা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। জয়নাগের কোনো পরিচয় জানা যায় না। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই তথ্যগুলিকে উপন্যাসিক যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস নীরব সেখানে উপন্যাসিকের কঢ়স্বর প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের তথ্যের অভাব উপন্যাসিকের কল্পনার দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মুদ্রা এবং অভিলেখ থেকে মনে করা যায় জয়নাগ ৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ববর্ধনের মৃত্যুর পরে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন। মহারাজাধিরাজ উপাধি থেকে মনে হয় তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন।<sup>১২</sup> History of Bengal -এ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

“On the basis of the tradition recorded in MMK. We may hold that after the anarchy and confusion caused by the invasion of Bhaskarvarman has subsided, and a son of Sasanka had vainly tried to reestablish the fortune of his family, the kingdom passed into the hands of Jaynaga.”<sup>১৩</sup>

রাধাগোবিন্দ বসাকের মসজ উদ্ধার করে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন

“It is just possible that Jaynag ruled after the death of Sasanka and before conquest of Karna Subarna by Bhaskar Varman.”<sup>১৪</sup>

শরদিন্দু কাহিনিতে এই দ্বিতীয় সূত্রটি গ্রহণ করেছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মানব ৮ মাস রাজত্ব করেন, কিন্তু তিনি ভাস্তুরবর্মার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি। ভাস্তুরবর্মা রাজপুরী দুদিন অবরোধ করে রাখার পর তৃতীয় দিনে পুরীতে প্রবেশ করেন। ইতিহাসে মানবদেবের কোনো

খবর মেলেন না। সম্ভবত তিনি এই যুদ্ধে নিহত হন বা শক্র হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যু ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে। মানবদেবের সঙ্গে নিশ্চয় ভাস্করবর্মার যুদ্ধ ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দেই হয়ে থাকবে। এর কুড়ি বছর পরের গল্ল বজ্রদেবের সিংহাসনারোহন। এটা একান্তই ইতিহাসের বাহিরের কথা। ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ জয়নাগ সিংহাসন দখল করতে পারেন। গল্ল অনুসারে ৬৫৭-৫৮ সাল। সেটা মারাত্মক ত্রুটি নয়। উপন্যাস অংশে শরদিন্দু মানবদেবের পুত্র বজ্রদেবকে একদিনের জন্য সিংহাসনে বসিয়েছেন। ইতিহাসে একথা পাওয়া যায় না। গৌড়ে মাংস্যন্যায়ের যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে লেখক এই অনৈতিহাসিক রোমাঞ্চিকর ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন। এ বিষয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টি অপেক্ষা অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাস এ উপন্যাসের মূল বিষয় নয়। পরিপার্শ্ব বা পটভূমি মাত্র। অন্যান্য উপন্যাসে রাজরাজড়ার কাহিনি তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ বা প্রণয় পরিণয় বিষয়বস্তু হলেও ‘গৌড়মঞ্চার’ উপন্যাসের বিষয় সাধারণ মানুষের জীবন কথা। পটভূমিকায় লেখক বলেছেন ‘শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে’ “বাঙালীর চরিত্র, সংস্কৃতি গ্রামজীবন নাগরিক জীবন কিরণ ছিল” তাই তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। শুধু এই নয় আরো কিছু উপপাদ্য তাঁর ছিল। সেগুলিকে সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায় লেখকের লক্ষ্য

১. ৭ম শতকের মধ্যভাগে বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা বলা
২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় দেওয়া
৩. এই মাংস্যন্যায়ের যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতির কথা বলা
৪. এই শতবার্ষিক ত্রুটিকালে বাঙালির বহির্বাণিজ্যের অবস্থা কী হ'ল তা দেখানো।

কাজেই লেখক এখানে কোনো প্রণয় কাহিনি কেন্দ্রিক রোমাঞ্চ রচনার উদ্দেশ্য নেন নি বরং দেশের সমাজ ইতিহাস ঘটিত বিষয়কে ইতিহাসের ইঙ্গিত নিয়ে গড়ে তুলেছেন। আর এই পুনর্গঠন কর্মে নীহারণঞ্জন রায়ের সংগৃহীত উপাদান তাঁর কাহিনির ভিত্তি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্ঞান তাঁর সহায়ক, সুকুমার সেনের বাংলা ও বাঙালি তাঁর সমাজ বোধের দর্শক।

এ উপন্যাসের শুরু আভীর পল্লীতে—বেতসগ্রামে। কর্ণসুবর্ণ থেকে বিশ ক্রোশ উত্তরে মৌরী নদীর তীরে। এটি শেষ গ্রাম। তারপর আর গ্রাম নেই। আর গ্রামে ইক্ষু মাড়াই দিয়ে কাহিনির শুরু। ইক্ষু ধান্য এবং গোধন গ্রামের তিন সম্পদ। এই তিন দিকের প্রসঙ্গই এ উপন্যাসে এসেছে। “গ্রামের দক্ষিণ দিকে ইক্ষু ও ধানের ক্ষেত। ধান্য ইক্ষু গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ...

গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী; ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়টি দেশের প্রাণবস্তু;”

‘সদৃক্তি কর্ণামৃত’-এ হেমন্তের বাঙ্গলার একটি ছবিতে এই গুড়ের কথা বলা হয়েছে : “সংস্কৃত-ধ্বনিদিক্ষুযন্ত্র মুখরা গ্রাম্য গুড়ামোদিন :”<sup>১৮</sup> (আখ মাড়াই কলের শব্দে মুখরিত গ্রামগুলি গুড়ের গন্ধে আমোদিত)। ধান এবং গোধন এই দুটি সম্পদ ও বাঙ্গলার অর্থনীতির প্রাণবন্ত। শরদিল্লু এই উপন্যাসে সেই সমাজ-অর্থনীতির দিক থেকেই কথারভ করেছেন। বহির্বাণিজ্যের কথাও প্রথমেই বলা হয়েছে। আর বাংলার সঙ্গে স্থলপথে উত্তর ভারতের যোগের কথাও এসেছে। তাস্তলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র পর্যন্ত পথের কথা নীহারণঞ্জন রায়ের লেখাতেও আছে। এই পথে সার্থবাহ, অস্তবর্ণিক ও তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করতেন। মোটের উপর শাস্ত নির্বিঘ্ন মন্ত্র গ্রাম্য জীবনের ছবি এঁকেই কাহিনির সূত্রপাত হ'ল। লেখকও মানুষের এই সুখ শাস্তির কথা বলে শুরু করেছেন : “বেত্রকুঞ্জে ক্লান্ত কিয়ণে দ্বিপ্রহরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে; কিশোরী সখীরা গলা ধরাধরি করিয়া মনের কথা বিনিময় করিতে যায়... প্রকৃতির কোনো সহজ মধুর মন্ত্র জীবনযাত্রা; জটিলতা নাই, আড়ম্বর নাই উদ্বেগ নাই। মহাকাল এখানে অতি মনুচ্ছন্দে পদপাত করেন।”

গ্রামের এই শাস্ত রসাস্পদ, সুখী ও সন্মিলিত জীবনের আনন্দের বৃত্তে একমাত্র গোপা ও রঙ্গনাই বিচ্ছিন্নতার দুঃখ ভোগ করছে। প্রথম পরিচ্ছেদের কাহিনি উপস্থাপনায় সন্মিলিত গ্রামীণ জীবনের ভিতর থেকে লেখক এই দুই নারীকে আলাদা করে নিলেন। গ্রাম পটভূমি রাপে পিছনে পড়ে রইল। এই দুই নারীর জীবনের উপর দিয়ে এবার কাহিনির রথচক্র ঘৰ্য্যারিত মন্ত্রে প্রবাহিত হয়ে চলবে।

কাহিনির সূত্রপাত ভাস্করবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে মানবদেবের পরাজয়ের দিনে। রণক্লান্ত মানবদেব কজঙ্গলের যুদ্ধে জয়ের আশা নেই দেখে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং পশ্চাদ্বাবনকারী শক্রদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বেতসগ্রামের উপকঠে এসে পৌঁছান। লেখক এখান থেকে কাহিনি শুরু করেছেন। ইতিহাসের কথা সূত্রে তিনি লিখেছেন শশাক্ষের মৃত্যুর ঠিক আট মাস পরে যুদ্ধে মানবদেব পরাজিত হন। ‘আজ হইতে ঠিক আটমাস পূর্বে গৌড়কেশরী শশাক্ষদেব বৃন্দ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন।’<sup>১৯</sup> আর বিস্ময়াহত মোহাচ্ছন্ন, রঙ্গনার প্রশ্নের উত্তরে মানবদেব জানিয়ে ছিলেন ‘আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু আপাতত রাজা।’<sup>২০</sup>

ইতিহাসে পাই ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাক্ষদেবের মৃত্যু হয়। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকঙ্গ’-এ বলা হয়েছে শশাক্ষের মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ কলহে ও বিদ্রোহে গৌড়রাষ্ট্র ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকঙ্গ’-এর প্রয়োজনীয় অংশের ইংরেজি অনুবাদে পাই—

“After the death of Soma the Ganda Political system was reduced to mutual distrust, raised weapons and mutual jealousy - One (king)

for a week; another for a month; then a republican constitution - such will be the daily condition of the country on the bank of the Ganges where houses were built on the ruins of monasteries. Thereafter Soma's (Sasanka's) son Manava will last for 8 months 5( $\frac{1}{2}$ ) days.”<sup>22</sup>

রঁমেশচন্দ্র মজুমদার এই বর্ণনাকে ‘অনেক পরিমাণে সত্য’ বলে স্বীকার করেন। আর এই অভ্যন্তরীণ কলহের কথা শরদিন্দু উপন্যাসেও বর্ণনা করেছেন। মানবের পরাজয়ের মূল কারণ হিশেবে তিনি মন্ত্রিগণের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেছেন। “রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রাজ্যের মর্মকোষে কীট প্রবেশ করিল।” শক্র পক্ষ এই সুযোগ নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করল। সেনাপতিদের মনেও ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষ সঞ্চারিত হয়েছিল। কাজেই মানবদের ভাস্করবর্মার হাতে পরাজিত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কর্ণসুরের পৌঁছে আর একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি। এর ঠিক পাঁচদিন পরে তিনি সিংহাসনচুজ্যত হন। তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল ইতিহাসে তা লেখেনি। যেখানে ইতিহাসের শেষ সেখান থেকেই কাহিনির সূচনা।

কঙ্গলে ভাস্করবর্মার সঙ্গে পরাজয় অবশ্যভাবী জেনে মানব রণত্যাগ করেছিলেন। তখনো মানবদের আশা ছাড়েননি। কিন্তু শক্ররা তার পশ্চাদ্বাবন করছিল। উপন্যাসে বলা হয়েছে পরদিন দিবা এক প্রহরের সময় ভাস্করবর্মার একদল সৈন্য—কুড়ি পঁচিশজন পদাতিক বেতসগ্রামে আসে। তারা জানতে চায় গৌড়ের রাজা বা রাজপুরুষ কেউ এখানে লুকিয়ে আছে কিনা। গ্রামের লোকেরা দলে ভারি বলে এরা গ্রামে লুটপাট চালাতে পারেনি। গ্রামের নিরুত্তাপ জীবনযাত্রার মধ্যে তারা ক্ষণিকের বিভাস্তি এনেছে বটে কিন্তু গ্রামীণ জীবনকে লগ্নভগ্ন করতে পারেনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা রাজড়ার যুদ্ধ গ্রামীণ জীবনের নিরুদ্ধে প্রশাস্তিকে খুব বেশি নষ্ট করতে পারেনি। চিরপ্রচলিত প্রথাবন্ধ জীবনের পরিবর্তন হয়নি। দেশের লোকেরা রাজার খোঁজও তেমন একটা রাখত না। মানবদেবকে রঙনা শশাঙ্কদেবের কথা বলেছে—কিন্তু শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর খবর গ্রামের কারো জানা নেই। না জেনেই তাদের জীবন চলত। হেমন্তে ইক্ষু মাড়াই এর কাজ যেদিন শুরু সেদিন কঙ্গলে রাজ্যরক্ষার এবং রাজার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলেছে—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। যুদ্ধে মানবের পরাজয়ের পরও আখ মাড়াইয়ের কাজ যথারীতি চলেছে। রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে প্রজার কোনো জ্ঞান ছিল না কোনো উৎসাহ ছিল না।

এই নিরগদিঘ আভীরপন্নীর গ্রামীণ বেতসকুঞ্জে রঙনার সঙ্গে মিলন হয়েছে কঙ্গনার রাজপুত্রের। চাতক ঠাকুরের ভবিষ্যৎ দর্শনের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। মানবদেব রঙনার বরমাল্য

গ্রহণ করেছেন, এক রাত্রি তার কুঞ্জে কাটিয়েছেন এবং অভিজ্ঞান অঙ্গদ রঙ্গনাকে দিয়ে আবার আসবার কথা বলে গেছেন। ইতিহাসের রাজপুত্র এখানে কঙ্গনার নায়ক হয়ে উঠেছে। মানবদেবের যে রূপ এখানে দেখি তাতে পাই তিনি স্বভাব-উন্মুক্ত ও অকপট চরিত্রের মানুষ। “মানুষটি যে স্বভাবতই মুক্ত প্রাণ, তাহা তাহার হাসি হইতে প্রতীয়মান হয়।” মানবদেব যুদ্ধে পরাজয়ে হতাশ নয় বরং জীবন রসিক পুরুষ। সম্মুখে রাত্রির আশ্রয় মিলেছে, সফেন দুঃখে ক্ষুধাত্ত্বণা ও তখনকার মতো তৃপ্ত; রঙ্গনার কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। “রঙ্গনার পুষ্পপেলব যৌবন লাবণ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।” বেতসকুঞ্জে শোলার মালা বদন করে মানবদেব মনের মানুষ খুঁজে পেলেন আর রঙ্গনা পেল তার সোনা পোকা—রাজপুত্র স্বামী। আর পেল প্রতিশ্রুতি যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি, ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। সে পথ করছি। মানবদেব আর রঙ্গনার এই মালাবদল বৃত্তান্তের মূল সূত্র মনে হয় রাজসিংহ উপন্যাসে নির্মলকুমারী-মানিকলালের সম্পর্ক বনুন এবং দুষ্মান্ত শকুন্তলার সম্পর্কের মেলবন্ধনে লিখিত।

মানবদেবের রাজ্যরক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু এখানে ইতিহাসের কথা একবার বলা দরকার। ভাস্করবর্মা শশাক্তের মৃত্যুর পরে মানবদেবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এমন কথা ইতিহাসে দেখা যায় না। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ গৌড় ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সেখানে চারটি পৃথক রাজ্য—পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাত্ত্বলিষ্ঠ—দেখেছিলেন। ভাস্করবর্মা এর কয়েক বছরের (within a few years) মধ্যে ভাস্করবর্মা এই রাজ্যগুলি দখল করেছিলেন। ৬৪২ খ্রি। তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে কজঙ্গলে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মিলিত হন। অবশ্য নীহাররঞ্জন রায় একটি অনুমানের কথা বলেছেন। “৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্ধন সাক্ষাৎকারের আগেই ভাস্করবর্মা কোনো সময় পুণ্ড্রবর্ধন কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণের স্বন্ধাবার হইতে এক ভূমিদান পট্টোলী নির্গত করাইয়াছিলেন।”<sup>১২</sup> ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার একথা বলেননি। তিনি বলেছেন আত্মাতী বিদ্রোহেই সম্ভবত শশাক্তের বিশাল রাজ্যের শক্তি নষ্ট হয় ও বহিঃশক্তির আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।<sup>১৩</sup> তবে History of Bengal (Vol. I) গ্রন্থে ড. রমেশচন্দ্র দন্ত লিখেছেন ভাস্করবর্মা এবং হর্ষবর্ধন ৬৩৪ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময় শশাক্তের রাজ্য দখল করেন। ইতিহাসের এই সংকেত লেখক মানবের সঙ্গে কজঙ্গলে ভাস্করবর্মার যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

মানবদেবের চরিত্রের যে সহজ মুক্তপ্রাণ অকপট চিত্র শরদিন্দু এঁকেছেন—ইতিহাসে তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকঙ্গ’ নামক বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া অন্যএ মানবদেবের রাজত্ব করবার কথাও নেই। তাই ইতিহাসিকেরা কেউ কেউ তথ্যের অভাবে এই কথাতেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এঁরা সকলেই স্বীকার করেন রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্যই রাজ্য নষ্ট

হয় এবং তা বহিঃশক্রদের পথ সুগম করে। ইতিহাসের এই ইঙ্গিতের ভিতর থেকেই শরদিন্দু মানব চরিত্রের সন্তান্য উপাদান পেয়ে থাকবেন। মানব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ‘‘পিতার মতই সে দুর্মদ বীর... কিন্তু মন্ত্রণাসভায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে নাই।’’ শশাঙ্ক ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি অসাধারণ কুটনীতিজ্ঞ ছিলেন। মানবের সে ক্ষমতা ছিল না। শশাঙ্ক সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন তিনি “‘গৌড় স্বাতন্ত্রের নায়ক।’”<sup>১৪</sup> তাঁর স্বাধীন গৌড়রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল ‘‘গৌড়তন্ত্র’’ গড়ে তোলা।<sup>১৫</sup> তিনি একটি নৃতন সদর্থক আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন—অনেক নৃতন নৃতন রাজপুরুষের পদ এবং রাজকর্ম বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় বলেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অনেক বেশি আত্মসচেতন হইয়াছে, নৃতন নৃতন সামাজিক দায় ও কর্তব্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে (ঐ, ১/৪৪৫)। এই আমলাতন্ত্রই তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনে। শরদিন্দু সেই বিপদের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। লক্ষণীয় বজ্রকে সিংহাসনে বসানোর ঘড়্যন্ত্রে প্রধান কারিগর ছিলেন শশাঙ্কের এক পুরানো মন্ত্র কোদণ্ড মিশ্র। ‘‘শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর মানবদেবের হৃব রাজত্বকালে মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই।’’ কোদণ্ড মিশ্র কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন শশাঙ্কদেব এবং যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজ্যনাশের রন্ধনপথ নির্মাণ করেছিল তিনি তাদেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর নাম নির্বাচনে, ভূমিকায়, আকৃতি রচনায় শরদিন্দু তাঁকে সে কালের একজন সাথর্ক প্রতিনিধি হিশেবে গড়ে তুলেছেন।

আবার মানবদেবের কথা প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যুদ্ধে পরাজিত মানবের মধ্যে কোথাও রাজ্যচ্যুত হবার উদ্দেগ এবং ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা দেখা যায় না। শশাঙ্কদেবের মতো তাঁর ত্যর্ক বুদ্ধিমত্তা দেখা যায় না। শরদিন্দুর লেখায় মানবের বীর ধর্ম এবং উদ্দেগ মুক্ত সহজ জীবনভোগের অভিলাষ লক্ষ করা যায়। ভবিষ্যৎ অনাগত এবং অনিশ্চিত, তাঁর জন্য এই মুহূর্তের জীবন সুখকে উপেক্ষা নয়—মানবকে প্রাচীন classical বীর চরিত্রের এই আদর্শে শরদিন্দু গড়ে তুলেছেন। তাঁর পক্ষে রাতের মত নিরাপদ আশ্রয় আহার এবং রঙ্গনার মতো সঙ্গীনী কোনোটাই উপেক্ষার বস্তু নয়। রঙ্গনার পক্ষে এইরকম অচেনা অজানা পরপুরুষের কাছে আত্মদান কর্তোটা বাস্তব সম্ভব -এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই সন্তান্যতা গড়ে তোলবার জন্য চাতক ঠাকুরের দুরদর্শিতা পরিচ্ছেদে তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শনের অবতারণা করা হয়েছে। রঙ্গনার চুলে সোনাপোকা বলতে দেখে চাতকঠাকুর হ্যালুসিনেশনের বশে (?) ভবিষ্যৎ দেখতে পেলেন। সোনা পোকা দেখে তাঁর মনে হল রঙ্গনার সিঁথিতে সিঁদুর ডগডগ করছে। এই ভাবে হঠাৎ ভয় হয়ে চাতকঠাকুর যুদ্ধ দেখলেন

আর রঙ্গনার চুলে সোনাপোকা বসতে দেখে বিয়ের সন্তান্য ইঙ্গিত পেলেন। রঙ্গনার মা গোপাকে বললেন ওর সিঁদুর পরার সময় হয়েছে— দেবতারা তাই ইশারায় জানিয়ে দিলেন। রঙ্গনার জন্য রাজপুত্রুর আসছে।

হ্যালুসিনেশনের বশে সোনাপোকাকে সিঁদুর ভেবে চাতকঠাকুর হয়ে divinely possessed পড়েন—অর্থাৎ তার উপর দেবতার ভর হয়। তার চেতনা ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই ভর যুক্ত অবস্থায় তিনি দেবতার ইশারা বুঝতে পারেন। ভর হওয়া বা দেবতার আবেশ বশে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া আমাদের লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীন গ্রিসে এ জিনিসে বিশ্বাস ছিল। হ্যালুসিনেশনে এখনো বিশ্বাস আছে। আর আমাদের দেশে এখনো লোকের ভর হয়। শরদিন্দু এই লোকবিশ্বাসের সাহায্য নিয়ে রঙ্গনার বিয়ের পটভূমি তৈরি করেছেন—গোপার বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করেছেন। তাছাড়া গোপার অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। গোপার জীবনে সৈন্য সংগ্রহকারী রাজপুরুষের আকস্মিক আগমন এবং রঙ্গনার জন্ম-এসবই তাকে গ্রামীণ মানুষের সমষ্টিবন্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। চাতকঠাকুর ছাড়া গ্রামের আর কারো সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল না, ফলে গ্রাম-সমাজে একঘরে নিঃসঙ্গ দুই নারীর পক্ষে দীর্ঘ অপেক্ষার দিনগুলি পেরিয়ে একটা আকস্মিক আশার আলো দেখতে পাওয়া—রঙ্গনার জীবনে স্বামীলাভের সুযোগ আর সব অবিশ্বাসকে ছাপিয়ে উঠেছে। এইভাবে দুই প্রজন্মের দুই রাজপুরুষের আগমনের ফলে রঙ্গনা এবং বজ্রের জন্ম। গ্রামীণ নারীদের যৌন শিথিলতার (?) কোনো সামাজিক ইঙ্গিত এখানে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। মানবদেব রঙ্গনাকে গোপনে বিয়ে করেছেন। এ হল বরকন্যার পরম্পর আকর্ষণ জনিত গান্ধর্ব বিবাহ। ‘গৌড়মল্লার’ সম্পর্কে হরেকুষও মুখোপাধ্যায় বলেন—“তোমার অমোঘবীর্য এক নায়ক কর্ণসুবর্ণের রাজবঞ্চি। দ্বিতীয় মানবদেবও অমোঘবীর্য। গোপাও যেমন রাঙাও তেমনই এক রাত্রেই গর্ভবতী। অবশ্য অসন্তুষ্ট কিছুই নয়। আর সেকালে হয়তো এমনই হইত।”<sup>১৬</sup>

এরপর বেতসগ্রামের কথা কম। কেবল বজ্রের বাল্যকালের দু-চারটি ছবি দিয়ে লেখক বজ্রকে যৌবনে উন্নীর্ণ করেছেন। মাঝের সময়টুকু গ্রামের শিশুদের বড় হয়ে ওঠার সময়কার সাধারণ বিবরণ। বত্রের শিক্ষা সক্ষমতা এবং গুঞ্জের প্রতি আকর্ষণের কাহিনি।

রাজনৈতিক ইতিহাস এ উপন্যাসের বিষয় কিন্তু কোনো রাজা বা রাজপুরুষকে কেন্দ্র করে সে কাহিনি গড়ে উঠেনি। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাক্ষের মৃত্যুর পর যে অরাজকতা শুরু হয়—শতবর্ষের মাঝস্যন্যায় হিশেবে যা ইতিহাসে পরিচিত—তারই প্রথম পর্বের কয়েকবছরের কাহিনি নিয়ে এ উপন্যাস রচিত। একটা ব্যাপারে কালগত সংগতি সম্বন্ধে সংশয় জাগে। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কোন

সময় মানবদেবের সঙ্গে রঞ্জনার গান্ধর্ব বিবাহ ও এক রাত্রির মিলন। তাহলে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কোনো সময় কিংবা ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বজ্রের জন্ম। রঞ্জনার সঙ্গে মানবের মিলন কোগে হৈমন্তিক সন্ধ্যায়, তখন মানবের শাসনকাল ৮ মাস অতিক্রম করেছে। হেমন্তে মিলন আর বর্ষায় বজ্রের জন্ম। সূর্য আদ্র্বা নক্ষত্রে; আকাশ পুঁজি পুঁজি মেঘে ঢাকা। বজ্রের হংকার ধ্বনির সঙ্গে বৃষ্টি পড়েছে। অর্থাৎ ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে বজ্রের জন্ম। ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ বজ্রের বয়স ২০ বছর পূর্ণ হবে।

ইতিহাসের যে সংকেত লেখক দিয়েছেন তাতে পাই ভাস্করবর্মা মারা গেছেন। তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা তখন রাজা। শীলভদ্র বজ্রকে বলেছেন ‘কয়েকবছর হল ভাস্করবর্মার মৃত্যু হয়েছে’। ভাস্করবর্মার মৃত্যু ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসে পাই ভাস্করবর্মার মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র রাজা হয়েছেন। অগ্নিমিত্রের উল্লেখ বাংলার ইতিহাসে নেই। তবে ‘আর্যমণ্ডুশ্রী মূলকল্পে’র সাক্ষ্য গৌড়ে এসময় প্রায়ই রাজা পরিবর্তন হত। কর্ণসুবর্ণের প্রজারা সে নিয়ে মাথা ঘামাত না। উপন্যাসে পাই কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্রে অগ্নিমিত্রের মৃত্যু হয়। কোকবর্মা রাণী শিখরিণীকে নিয়ে যান। আর একদিনের রাজা বজ্রের হাতে কোকবর্মার মৃত্যু হয়। কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বজ্রকে সিংহাসনে বসান, আবার রাণী শিখরিণীকে হস্তগত করে জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বজ্রদেবের একদিনের শাসন—একদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে আরোহন ইতিহাস অনুমোদিত নয়, কিন্তু এ সময়কার অস্থির শাসন ব্যবহার চিত্র। বজ্রদেব উপন্যাসের চরিত্র, লেখকের কল্পনার সৃষ্টি; কিন্তু লেখক তাকেও ইতিহাসের গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত করে সে সময়কার ইতিহাসের ধারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

উপন্যাস অনুসারে বজ্রের কুড়ি বছর হিশেবের দিক থেকে ৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে হবার কথা। অথচ ইতিহাসে দেখি জয়নাগ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কর্ণসুবর্ণ দখল করেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন “গৌড়ে ভাস্করবর্মার অধিকার খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ইঁহার পরেই জয়নাগ নামক একজন রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন।”<sup>২৭</sup> আবার

“History of Bengal (Vol I) অনুসারে On the basis of the tradition recorded in MMK. We may hold that after the anarchy and confusion caused by the invasion of Bhaskaravarman had subsided, and a son of Sasanka had vainly tried to reestablish the fortune of his family the Kingdom passed into the hands of Jaynaga.”<sup>২৮</sup>

এই ইতিহাস অনুসারে ভাস্করবর্মার আক্রমণের পর মানবদেব (বা কোন পুত্র) রাজ্য

পুনরংদ্বার করতে চেয়েছিলেন। আসলে এই পর্বের ইতিহাস যথেষ্ট তথ্যের অভাবে পুনর্নির্মাণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। শরদিন্দু যা করেছেন তাতে ইতিহাসের ধারাকে সহজ পথে চালিত করা হয়েছে। মানব ভাস্করবর্মার হাতে নিহত হয়নি অন্ধ হয়ে নদীতে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত কুল পেয়েছেন। আর সেটা তার যুদ্ধে পরাজয়ের পাঁচ দিনের ভিতরের ঘটনা। তারপর বজ্রের জন্ম থেকে কুড়ি বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত অন্ধ মানব পথে পথে বেতসগ্রাম খুঁজে ফিরেছেন। আর সেই হিশেবে মানবের পুত্র বজ্র ৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে একদিনের জন্য রাজা হয়েছেন। ইতিহাসে যেটা জয়নাগের রাজত্বকাল। অবশ্য জয়নাগ কতদিন রাজত্ব করেছেন তা জানা যায় না। সে যাইহোক গল্পের দিক থেকে শরদিন্দু ইতিহাসের ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ কালের জয়নাগকে আরো দশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। তাতে ইতিহাসের তথ্যভঙ্গ হতে পারে কিন্তু মাংস্যন্যায় পর্বের ইতিহাসের সত্যভঙ্গ হয়নি। বজ্র কঙ্গনার সৃষ্টি—তাকে দিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বদল পুনর্বাদলের ছবিটা দেখানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু তথ্যগত ইতিহাসের ক্রমভঙ্গ দোষের কথা বাদ দিলে লেখক এ উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক জীবনের কথা যথাসত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। সেটা ইতিহাসের আলোয় অতীতের পুনর্নির্মাণ।

বজ্র এ কাহিনির নায়ক। এ উপন্যাসের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ বেতসগ্রামের পটভূমিতে ঘটা ঘটনার বিবরণ। বজ্রের জন্ম, তার বড় হওয়া, বজ্র গুঞ্জা সম্পর্ক, গ্রামের কথা—এসব নিয়ে এই কঠি পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে বজ্র উনিশ পেরিয়ে কুড়ি বছরে পড়েছে। আর তার জন্ম কথা জেনে সে কর্ণসুবর্ণের উদ্দেশে পিতার সন্ধানে যাত্রা করেছে। প্রথম আট পরিচ্ছেদ বজ্রের গ্রাম জীবন। লেখক সামাজিক ইতিহাসের দিকে আর একটু মনোযোগ দিয়ে সপ্তম শতাব্দীর গ্রাম জীবনের সম্ভাব্য একটি ছবি আরও বিশদ করে আঁকতে পারতেন। অবশ্য গ্রামের দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ছবি তিনি দিয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদে বজ্র গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরোয়। বজ্রের যাত্রাপথের বর্ণনার সূত্রে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। বজ্রের জীবনের প্রথম পর্ব গ্রাম জীবন, দ্বিতীয় পর্ব অরণ্য পরিবেশ, তৃতীয় পর্ব নগর জীবন। প্রথম পর্বের কিছুটা অংশ ছাড়া বাকি অংশ বজ্রের অভিজ্ঞতার সূত্রে উঠে এসেছে। কাহিনিতে পাই অরণ্য জীবনের কথা। গল্পের প্রয়োজনে লেখক বজ্রের ভ্রমণ পথের প্রথম অভিজ্ঞতা হিশেবে দেখান এক বৃদ্ধ অন্ধের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা। এটুকু গল্পের পরবর্তী অংশের সঙ্গে যোগহীন, কিন্তু বজ্রের পিতার কথা সূত্রে প্রয়োজনীয়। বনপথে শবর জীবনের সরল এবং আন্তরিক রূপের সঙ্গে বজ্রের পরিচয় হয়েছে। এর দুটি প্রয়োজন ছিল। প্রথমত হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা অনুসারে সপ্তম শতকে বাংলায় আর্য

প্রভাবের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু যারা বাংলার আদি অধিবাসী তাদের জীবন কেমন ছিল তা দেখান দরকার। এরা প্রধানত অরণ্যে, পর্বতগুহায়, বা কোন দুর্গম স্থানে বসবাস করতো। তাদের জীবনযাপনের ছবি ‘গৌড়মল্লারে’র একটি স্বর হিশেবে উঠে এসেছে। তাদের সহজ সরল জীবনরূপ, খাদ্য সংগ্রহ, নারী পুরুষের সহজ সম্পর্ক অকৃষ্ট প্রণয়লীলা—অতিথি প্রীতি—এসবই ৭ম শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির একটি অপরিত্যজ্য দিক। শবর জীবনের এই রূপটি চর্যাগীতির শবর জীবনের আদর্শে গঠিত। আর একটা কথা। শবর শবরীর এই আদিম সরলতা দেখে বজ্র মুঞ্চ হয়েছে। বজ্র গ্রামের মানুষ। সে জীবন ও অনাবশ্যক জটিল নয়। কিন্তু তাও বজ্রের মনে হয়েছে—“কী মধুর ইহাদের জীবন! এই তিনটি আদিম নরনারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালবাসা! ঈর্ষা নাই, স্বার্থপরতা নাই ক্ষুদ্রতা নাই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য।” বজ্রের এই অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল। কেননা কর্ণসুবর্ণের জীবন যাত্রার মধ্যে সে আর কয়েকদিনের মধ্যেই গিয়ে পড়বে।

পথের অভিজ্ঞতার সূত্রে এরপর এসেছে ‘জয়নাগ’ নামের সঙ্গে পরিচয়। বজ্র ‘জয়নাগ’ সম্পর্কে জেনেছে শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ বিহারে। কিন্তু লেখক তার অভিজ্ঞতার মধ্যে জয়নাগের দলের গোপনে রাজ্যে চুকে পড়া রাজ্যে ক্রমে ক্রমে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা—ষড়যন্ত্র করে রাজ্য দখল—এসব এনে রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। রাজা অগ্নিমিত্র ভোগ জর্জর, প্রশাসনে তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই, রাণী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন, রাজপুরী হয়ে উঠেছে নরক—এসবই রাজ্যের দুর্বলতা হিশেবে দেখানো হয়েছে। জয়নাগ এ কাহিনিতে শেষ পর্যন্ত কর্ণসুবর্ণ দখল করবেন। কীভাবে তিনি তা করবেন তার ইঙ্গিত বজ্রের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখানো হয়েছে।

শীলভদ্র ও বৌদ্ধবিহারের কথা বজ্রের অভিজ্ঞতার তৃতীয় দিক। রাতের আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে কচ্ছু শবরের সঙ্গে তার দেখা হয়। এই রাতের আশ্রয়ের খোঁজ করতে গিয়েই সে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে পৌঁছায়। রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার কোনো কল্পিত বিষয় নয়। ইতিহাসে সে মহাবিহারের কথা পাওয়া যায়। হিউয়ের সাঙ এর বিবরণে পাওয়া যায় রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপাস্তে এই বিহার অবস্থিত ছিল। অনেক বৌদ্ধ শ্রমণ এখানে থাকতেন এটিকে তিনি “magnificent and famous establishment” (R.C. Majumdar (ed), History of Bengal, Vol-I, p. 414) বলে উল্লেখ করেছেন। কর্ণসুবর্ণে দশটি বা তার কিছু বেশি বৌদ্ধ বিহার ছিল। (ঐ) খনন কার্যের ফলে কর্ণসুবর্ণের রাজবাড়ী ডাঙ্গায় একটি বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। (নীহারুরঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, (দ্বিতীয় পর্ব), সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৯৪৩) তবে বজ্রের সঙ্গে শীলভদ্রের দেখা হওয়া—লেখকের কল্পনা প্রসূত। শীলভদ্র অবশ্য এই যুগের মানুষ ছিলেন। হিউয়েন সাঙ

তাঁর কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কাজেই শীলভদ্রকে এই বিহারে দেখানো অনৈতিহাসিক নয়। শীলভদ্র বজ্রকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পেরেছেন—তাকে কর্ণসুবর্ণে যেতে নিয়েখ করেছেন। তিনি বজ্রকে মানবদেবের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। কর্ণসুবর্ণের রাজা ভাস্করবর্মার মৃত্যুর কথা বলেছেন এবং বর্তমান রাজা অশ্বিবর্মার কথা বলেছেন। যতদূর জানা যায় ভাস্করবর্মা অকৃতদার ছিলেন, সুতরাং তাঁর পুত্র অশ্বিবর্মা নিতান্তই কাঙ্গনিক চরিত্র। এই বৌদ্ধবিহার ও শীলভদ্রের প্রসঙ্গ লেখক এনেছেন সম্ভবত গল্পের একটি সূত্র তুলে দেবার জন্য। শীলভদ্র বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি শশাঙ্কের গুণগ্রাহী হবার কথা না। শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্যে সুপরিচিত। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণে বা ‘আর্যমঞ্চুশ্রী মূলকল্পে’ সে কথাই আছে। নীহাররঞ্জন রায় ‘বাঙালীর ইতিহাস’-এ একে ‘নিছক অনৈতিহাসিক কঙ্গনা’ (১/৪৪৯) উড়িয়ে দিতে চান না। রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্কের দোষ স্থালনের পক্ষপাতী। শরদিন্দু শীলভদ্রের মুখে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্যকে ‘যুদ্ধের উভেজনা’ সংজ্ঞাত বলে ব্যাখ্যা করিয়েছেন। তিনি শশাঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে বুঝিয়ে বলার পর শশাঙ্ক আর কোনো বিদ্যে দেখান নি। শশাঙ্কের দোষস্থালন শুধু নয় শীলভদ্রের মাধ্যমে বজ্রকে কর্ণসুবর্ণের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে। শীলভদ্র বজ্রকে সোনার অঙ্গদ ঢেকে রাখবার উপদেশ দিয়েছেন। আর একটি তথ্য এখানে জানানো হয়েছে। এদেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুইই বিনষ্ট হয়েছে। দেশ দস্যু তাকরে পূর্ণ। অরাজক দেশে সাধু ও তঙ্কর হয় এ সব সামাজিক পরিস্থিতির কথা পাঠককে জানানো দরকার। অন্য কোনো চরিত্রের দ্বারা এ কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই শীলভদ্রের মুখে রাষ্ট্রের পরিস্থিতি জানাতে হল। আর এই রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি সবটাই তথ্যগত। এ গুলি বাংলাদেশের ইতিহাসের তথ্য সম্মত পরিচয়। এই পরিচয় যেমন সামাজিক পরিস্থিতি অবহিত করার জন্য প্রয়োজন তেমনি কাহিনির জন্য একটি সূত্র এখানে দেওয়া হয়েছে—যা পরে কাজে লাগবে। শীলভদ্র বজ্রকে বলেছেন কোদণ্ড মিশ্রের কথা। তিনি একসময় শশাঙ্কদেবের সচিব ছিলেন। এই পরিচয়ই কাহিনিতে একটা Jerk আনবে। কাহিনিকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। বজ্রের জন্ম বর্ণনা করে যে কাহিনির শুরু সেই বজ্রের জীবনকে লেখক একটা আকস্মিকতায় গড়ে তুলেছেন।

অয়োদ্ধ পরিচ্ছদে কাহিনি নগরে গিয়ে পৌঁছল। নায়ক বজ্র গ্রাম অরণ্য ও বৌদ্ধবিহারের জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করে নগরে এসে দাঁড়াল। বজ্রের এই যাত্রাকে আধুনিক নায়কের আত্মসন্ধানে যাত্রা হিশেবে দেখতে ইচ্ছা হয়। নানা কারণে তা করা যাবে না। তবু সতীনাথ ভাদুড়ীর টেঁড়িই যেমন গ্রাম ছেড়ে বিসকান্ধা হয়ে গান্ধীবাদী হয় এবং শেষে আজাদ দস্তায় গিয়ে পৌঁছায় এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়, এখানে বজ্রও সেই ভাবে একটার পর একটা জীবন পর্ব

অতিক্রম করে চলেছে। শীলভদ্র তাকে নগরে যেতে নিষেধ করেছিলেন—কিন্তু বজ্র সে নিষেধ শোনেনি। শীলভদ্র তাকে কর্ণসুবর্ণে আসন্ন যুদ্ধের পরিস্থিতির কথাও বলেছেন বজ্র তাও শোনেনি। নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তবে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে চরিত্রের অস্তর্মূল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে তার জীবনের ভাবনা, অনুভূতি ও চেতনাকে বদলে দেয় সেরকম চরিত্র বজ্রের নয়। বজ্রের প্রাথমিক ভাবনা-চিন্তা ও অনুভূতির পরিবর্তন হয়নি। তার চরিত্র অনেকটা টাইপধর্মী।

কর্ণসুবর্ণে বজ্র যে অভিজ্ঞতাগুলির মধ্য দিয়ে গেছে সেগুলি হল : ১. নগরজীবন, ২. বাণিজ্য ব্যবস্থা, ৩. রাজাস্তঃপুরের পরিবেশ এবং ৪. একদিনের রাজা হবার অভিজ্ঞতা। নগরজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলি পরপর জড়িত হয়ে এসেছে। কর্ণসুবর্ণের সৌন্দর্য মুঢ় বজ্র এই নগরের সঙ্গে যেন নাড়ীর টান অনুভব করেছে। কিন্তু একটা বিপরীতমুখী মনোভাব তাকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক করে দিয়েছে। এজন্য নগরের টানে বজ্র ভেসে যায়নি। কর্ণসুবর্ণে বজ্রের প্রথম পরিচয় কবি বিশ্বাধরের সঙ্গে। বিশ্বাধর লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয় বিলাসী, তরল স্বভাবের মানুষ। দুঃখের বিষয় কর্ণসুবর্ণে কোন যথার্থ ভদ্র নাগরিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। লেখক তাকে নগরের অস্তকার দিকটির দিকেই নিয়ে গেছেন কাজেই তার অভিজ্ঞতায় নগরের সামগ্রিক পরিচয় ধরা পড়ে নি। কবি বিশ্বাধর সেকালের নাগরিক বাঙালীর একটি টাইপ। নীহারঞ্জন রায় ‘বাঙালীর ইতিহাস’-এ সেকালের বাঙালির যে রূপ রচনা করেছেন—শরদিন্দু তাকে হৃবহু অনুসরণ করেছেন। বিশ্বাধর নিজের নাম বলেছে—‘কবি বিশ্বাধর’। অর্থাৎ তার প্রধান পরিচয় সে কবি। প্রাচীন গ্রন্থে বাঙালীর ‘কবি’ পরিচয় কোথাও আছে কিনা বলা যায় না। তবে একালের বাঙালীর ‘কবি’ পরিচয় বহু বিখ্যাত। সেই সূত্রে বাঙালীর প্রাচীন চরিত্র পরিচয়ে ‘কবি’ হবার বাসনা থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্বাধর আদিরসের চুটুল কবিতা লিখে বড় লোকের বৈঠকখানায় শোনাত। বিশ্বাধর “তালপত্রের ন্যায় কৃশ” কিন্তু তার সাজসজ্জা বেশ পরিপাটি। ধূতি উত্তরীয় তার পরিধান, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। কবি ক্ষেমেন্দ্র গৌড়ের ছাত্রদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন “এই সব ছাত্রের দেহ এত ক্ষীণ যে, হস্ত স্পর্শেই ইহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে” (নীহারঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১২৬) বিশ্বাধর ক্ষেমেন্দ্রের আদর্শে গড়া। বাংস্যায়ন গৌড় পুরুষদের সম্মনে খবর দিয়েছেন— তারা আঙুলে বড় বড় নখ রাখতেন এবং নখে রঙ লাগাতেন (নীহারঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৩৭১)। শরদিন্দু বিশ্বাধরের নখ রাখার কথা বলেছেন। সূক্ষ্ম বন্দু পরিধানের কথাও বাংস্যায়নের লেখায় আছে। ইতিহাসের তথ্য দিয়ে কর্ণসুবর্ণের নাগরিক মানুষের রূপ গড়া হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসে তথ্য ঠিক রেখে শরদিন্দু বিশ্বাধরের মত মানুষ গড়েছেন। বিশ্বাধর বজ্রকে নিয়ে দুদণ্ড মঞ্চরা করতে চেয়েছিল। তার প্রচুর আহার বিশ্বাধরের কৌতুহল জাগায়। অঙ্গ কয়েকটি

কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতু মুদ্রা দিয়ে বজ্র ময়রার দোকানের খাবার প্রায় শেষ করে এনেছে। লেখক বলেছেন “সেকালে বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না”; দেশে সোনারূপার অভাব হয়েছিল অন্নবস্ত্রের অভাব হয়নি। এই কথাটি বোঝানোর জন্য বজ্রকে অন্ন মূল্যে অনেক খাবার দিতে হয়েছে।

দেশে সোনারূপার অভাব হয়েছিল—সেকথা শীলভদ্র ও বলেছিলেন। ৭ম শতকে দেশে বহির্বাণিজ্যে সংকট দেখা দিয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনিক স্থিরতা ছিল না বলে অন্তর্বাণিজ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। বহির্বাণিজ্যের অভাবে দেশে সোনা রূপা আসছিল না। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন শশাঙ্কের আমলেই বাঙলার রাষ্ট্রীয় অবস্থায় গুরুতর চাথৰ্ল্য দেখা দিয়াছিল। ... অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ১৯১) সোনা অত্যন্ত দুর্মূল্যও হয়েছিল। আর নগরের সাধারণ লোকও যে দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে কবি বিস্বাধরের মত লঘুচিত্ত রংপুর লোকেরও—বজ্রের অঙ্গদ অপহরণ করবার উদ্দেশ্যের মধ্যে। বজ্র অর্থের প্রয়োজনে বিস্বাধরের সঙ্গে স্বর্ণকারের কাছে যায়। তাতেও এই সোনার দুর্মূল্যতার কথা ওঠে।

নগরে বজ্রের দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা রাণী শিখরিণী দর্শন। লেখক বলেছেন “নারী নয়, ললৎ-শিখা লালসার বক্তি” তার বর্ণনা এখানে উদ্ভৃত করার দরকার নেই শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ‘তার মুখে এমন কিছু আছে যা পুরুষের স্নায়ুশোনিতে আগুন লাগিয়ে দেয়’। এই লালসাবক্তি রাণী শিখরিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ গল্পের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্বর্ণ বিক্রয় করে বজ্র কর্ণসুবর্ণে এক জনবিরল প্রান্তে শৌণ্ডিক বটেশ্বরের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তার পক্ষে কাহিনিতে কোন মোচড় আনা সম্ভব ছিল না। দু’জন মানুষ বজ্রকে নিয়ে কাহিনিতে মোড় ফিরিয়েছে। একজন কবি বিস্বাধর অন্যজন রাণী শিখরিণী। বিস্বাধর তার অঙ্গদ চুরি করতে চায়, শিখরিণী তার বজ্র কঠিন দেহ সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হয়ে কামনা চরিতার্থ করতে চায়। কাহিনি বজ্রকে নিয়ে এই দুই চরিত্রের দ্বিমুখী ক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে। এখন বজ্র যেন নেহাতই নিষ্ক্রিয় চরিত্র—অন্য চরিত্রগুলির ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখানো ছাড়া তার অন্য ভূমিকা নেই।

রাণী শিখরিণীর দাসী কুহু রাপসী ‘চটুলা ছলনাময়ী রতি রস চতুরা।’ কুহু রাণী শিখরিণীর আসঙ্গ লিঙ্গা মেটানোর জন্য নাগর সংগ্রহের দৃতী। রাণী বজ্রের দিকে তপ্ত তীব্র চক্ষু দুটি দিয়ে বজ্রকে বিদ্ধ করেছেন, কুহুকে ইশারা করে বজ্রের খোঁজ নিতে বলেছেন। রাজ অন্তপুরে রাণীর কামনার নিত্য বহ্ন্যৎসব। তাতে নৃতন নৃতন ইঞ্চন চাই; সংগ্রহের দায়িত্ব কুহু বা কুহুর মতো একাধিক দাসী সহচরীর। কুহু রাণীর ইঙ্গিতে বজ্রের সন্ধানে যায় কিন্তু নিজেও বজ্রের প্রতি আকৃষ্ট

হয়ে পড়ে। “বজ্জকে দেখিয়া রাণীর লিঙ্গা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহও তেমনি মজিয়া ছিল।” কুহ নানাভাবে বজ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। মৌরীর ঘাটে বজ্জের দিকে ক্ষিপ্র- গোপন কটাক্ষপাত করে তার চোখের সামনেই নিরংশুকা হয়ে স্নান করতে নেমেছে। চোখের সংকেতে, মঞ্জীরের ছন্দে কিংবা ইঙ্গিতে তার আহ্বান জানিয়েছে কিন্তু বজ্জ সে আহ্বান বোঝেনি বা উপেক্ষা করেছে। কুহ বাধ্য হয়ে রাত্রির মত গাঢ় নীল বসনে দেহ ঢেকে অভিসার করেছে। বজ্জকে সে বলেছে “আমি কী চাই তা কি এখনও বুবাতে পারেন নি ?” চক্ষ দিয়ে সর্বাঙ্গ লেহন করে স্পষ্ট ভাষায় নিজের আকৃতি জানিয়েছে “আপনি আমার মধুনাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।” বজ্জ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কুহ তাকে তার ঘরে পোঁচ্চে দিতে বলেছে। বজ্জ তাকে বাড়ি পোঁচ্চে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে কুহ রাজ অবরোধের বাসিন্দা রাজপুরীর দাসী। কিন্তু বজ্জ তখনো বোঝেনি শুধু কুহ নয় রাণীও তার ক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্য বজ্জকে চায়। লেখক রাণী ও কুহ দুই নারীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন রাণীর প্রকৃতি বাধিনীর ন্যায় নিষ্ঠুর ও আত্মসর্বস্ব; কুহ সপিনীর ন্যায় ত্রুং এবং কুশলী। সে শিকারকে সম্মোহিত করে আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে আত্মসাং করে বিস্ময়ের কথা এই যে বজ্জ চরিত্রে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। সে এমনই সত্যকাম যে নিজেকে গুঁজার প্রতি বাগদত্ত ভেবে সব আবিলতা থেকে মুক্ত রাখে। রাণীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যই কুহ আবার বজ্জের খোঁজে যায় কিন্তু তার আগেই বজ্জ হরণ হয়। বিস্মাধর ও বটেশ্বর—যারা এ গল্পে কর্ণসুবর্ণের নাগরিক সমাজের লোক—তাদের প্রকৃতিও এতে ধরা পড়ে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে নগরজীবনের তার একটি দিক পরিষ্কৃট হয়েছে। চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে একটি সংবাদ আছে। বজ্জ বিকেল বেলাটা অধিকাংশদিন হাতী ঘাটে গিয়ে বসত। সেখানে নানা লোকের কথা বজ্জের কানে আসত। বেশিরভাগ জলনা হত ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাচ্ছে কেউ আর পণ্য নিয়ে সমুদ্রে যেতে সাহস করে না। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শীলভদ্রও বলেছিলেন অস্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুই নষ্ট হয়ে গেছে। এতে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের এই ক্ষীয়মাণ চরিত্রাটি ৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থে পরিষ্কৃট হয়ে উঠেছিল। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এই সংবাদটি কারণ সমেত চিত্রিত হয়েছে। কর্ণসুবর্ণের বরুণ দন্ত ওরফে চারুদন্তের কথায় এই ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বরুণ দন্ত বলেছেন পুরুষানুক্রমে তাঁরা সমুদ্র বাণিজ্য করে এসেছেন। নানা দেশে তাঁদের বাণিজ্য তরণী পণ্য নিয়ে যাত্রা করেছে। কিন্তু বর্তমানে আরব দেশের দস্যুরা সমুদ্র পথ বিপদ সংকুল করে তুলেছে। তাদের দৌরান্ত্যে গৌড়বঙ্গের বাণিজ্য থায় বন্ধ। আসলে ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য কম; লেখক সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাই বেশি নজর দিতে

পেরেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যার কথা নীহাররঞ্জন রায়ও লিখেছেন। এই যুগে “অস্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুইই খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৯১) কিন্তু তিনি এর কোনো কারণ নির্দেশ করেননি। বরং জিজ্ঞাসা আকারে তাকে উপস্থিত করেছেন। “যে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর, প্রাচীন বাঙ্গলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি হইয়াছিল কি?” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৯১) নীহাররঞ্জন কারণ নির্দেশ করেননি শরদিন্দু করেছেন। তিনি স্পষ্টতই আরবদেশের সমুদ্র-দস্যদের দৌরাত্মের কথা লিখেছেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর খলিমা উমরের আমলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুস্তাফার নিকট থানেতে এবং ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুনদের মোহনাতে অবস্থিত দেবল বন্দরে মুসলিম অভিযান হয়। আরবদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধে উদ্বৃত্ত হয়ে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের চেষ্টা জাগে। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যও তারা সামগ্রিক অধিকার বিস্তার করে। এর ফল “মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে মুসলিমরা হানা দিল এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সমস্ত সম্পর্ক ছেদনের প্রক্রিয়াকে তারা সম্পূর্ণ করল”<sup>১৯</sup> যদিও তিনি লিখেছেন আরবীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বাণিজ্য ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের পরেও অনেকদিন স্বাভাবিকভাবে চলেছিল। কিন্তু আরবদের উত্থান যে সমুদ্র বাণিজ্য ভারতীয় বাণিজ্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তা মনে করা যায়। কাজেই শরদিন্দুর এই বিশ্লেষণ অঙ্গীকার করার মতো নয়। লেখক এই সামাজিক ইতিহাসের ঘটনাকে মূল কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বরং দন্ত ওরফে চারুদন্তের পুরুষানুক্রমিক বাণিজ্য এভাবে বিনষ্টির দিকে চলে যায়। বরং দন্তকে এখানে বণিক সমাজের মুখ্যপাত্র হিশেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ শুধু তার একার সমস্যা নয় সমস্ত বণিক শ্রেণির সমস্যা। সমুদ্র বাণিজ্য যাবার জন্য বণিকেরা তাদের তরণীগুলিকে একসঙ্গে সমুদ্রে পাঠানোর চেষ্টা করে। জলদস্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নৌকাগুলিতে সৈন্য পাঠায়। কিন্তু বাঙালি সৈন্য সমুদ্র যুদ্ধে অভ্যস্ত নয়, তারা এ কাজ করতে চায় না। এই সৈন্য সংগ্রহের প্রয়োজনের সঙ্গে বটেশ্বর বিষ্঵াধরের অঙ্গদ চুরির ইচ্ছাকে মিলিয়ে বজ্রকে কৌশলে ভুরিবসুর বাণিজ্য-তরীতে তোলা হয়েছে। সেখান থেকে বজ্র নিজের শক্তিতে নাবিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিয়েছে। ভাগীরথীতে সাঁতার দিয়ে সে যে ঘাটে এসে পোঁছেছে সেখান থেতে তার পরবর্তী ভূমিকার আরম্ভ। সেখানে ইতিহাসের ভূমিকা সামান্য কল্পনার ভূমিকা অনন্য।

‘আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে’ শাশাক্ষের মৃত্যুর পর গৌড়ের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। কোনো রাজা এক সপ্তাহ কেউ একমাস কেউ বা আরো কম দিনের জন্য রাজত্ব করেছেন। এই অনিশ্চয়তার পিছনে ছিল পারম্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ। কিন্তু সেখানে এই রাজাদের নাম বা শাসনকালের কথা নেই। এই মাংস্যন্যায় পর্বের অস্থির ইতিহাসের অন্ধকার

অতীতে কল্পনাকে প্রেরণ করে সম্ভাব্য ইতিহাসের গল্প গড়ে তুলেছেন। বজ্র কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, তার জন্মের মূলে কালিদাসের দুষ্যস্ত শকুন্তলার মিলন কথার রেশ আছে বলে মনে হয়। তার রাজ্য লাভের পিছনে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসের ছায়া আছে। কোদণ্ড মিশ্র অপসারিত হ্বার পর থেকেই ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। কোকবর্মা প্রথম ষড়যন্ত্রের অংশীদার নয় অনেক ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টার একটি চরিত্র মাত্র। বজ্রকে পাওয়ায় এই ষড়যন্ত্র একটা সাফল্যের মুখ দেখেছে। কোদণ্ড মিশ্র নিজেকে বলেছেন ‘কৌটিল্যের শিষ্য’। কাজেই চাণক্যের কথা স্পষ্টত লেখকের ভাবনায় ছিল। কিন্তু যা ছিল না তা হল চন্দ্রগুপ্তের মত বজ্রের প্রস্তুতি বা শিক্ষা। কোকবর্মা বজ্রের প্রতি “সামর্য দীর্ঘা বক্ষিম দৃষ্টি নিষ্কেপ” করে গেছে। বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের অন্তর হিশেবে কেবল ব্যবহৃত হ্বার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। তার এতে কোনো মতামত নেই। ষড়যন্ত্র ও রাজপুরী দখল করবার চেষ্টা বাইরের দিক থেকে যখন চলছে, তখন লেখক রাজ-অন্তঃপুরের ভোগ-জর্জর প্রকৃতি শিথিল-সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা দু-তিনটি পরিচ্ছেদে বলে দিয়েছেন। রাণী শিখরিণীর ভোগে কোনো ক্লান্তি নেই। দুর্বল অগ্নিবর্মার দুর্মন্দ ভোগলালসার ত্রপ্তি নেই। রাজপুরী অন্তঃসারহীন।

উপন্যাসে জয়নাগের কথা বজ্র তার কর্ণসুবর্ণ যাত্রা পথেই শুনে এসেছে। জয়নাগ অবশ্য ঐতিহাসিক পুরুষ। জয়নাগকে ইতিহাসে মহা রাজাধিরাজ বলা হয়েছে। কর্ণসুবর্ণের জয় স্বর্কাবার থেকে তিনি কিছু ভূমিদান করেছিলেন। বীরভূম মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তাঁর নামাক্ষিত কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১/৪৪৩) পিতৃ রাজ্য পুনরধিকারের একটা চেষ্টা করিয়া থাকিবেন ... কিন্তু তাহার পরই কর্ণসুবর্ণ জয়নাগের করায়ন্ত হয়।” (নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৪৩-৪৪) ইতিহাসের এই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে শরদিন্দু জয়নাগের কর্ণসুবর্ণ দখলেই কার্যত উপন্যাসের পরিণতি ঘটিয়েছেন।

কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কোকবর্মা বজ্রকে রাজ্য দখলে সাহায্য করেছেন। বজ্র একদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণের রাজসিংহাসনে বসেছে। অর্জুন সেন অগ্নিবর্মার দেহ প্রদীপে ফুঁকারে নিভিয়ে দিয়েছেন কোকবর্মা রাণী শিখরিণীকে নিয়ে রাজপুরী ছেড়ে গেছে। মাত্র দুশো পণ্য যোদ্ধা পুরুষার রক্ষা করছে। বজ্র এই সৈন্যদের নিয়ে রাজপুরী রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু জয়নাগের বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ নিষ্ফল। তাছাড়া কোদণ্ড মিশ্রের এই রাজা রাজা খেলা বজ্রের পচন্দ নয়, তার গ্রামের জীবনেই ফিরে যাবার ইচ্ছা। বজ্র প্রাসাদ শিখর থেকে কোকবর্মাকে শরাঘাতে হত্যা করেছে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি। জয়নাগের সৈন্য দল প্রাসাদে প্রবেশ করেছে বজ্র কুঠকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে গেছে। এরপর কাহিনির উপসংহার মাত্র বাকি। বজ্র গ্রামে ফিরে গেছে। কিন্তু গ্রামগুলি সৈন্যদের আক্রমণে বিধ্বস্ত। লোকজন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বজ্রের পরিবার

পলাশবনে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পেয়েছে। মানবদেবের সঙ্গে বজ্রের মিলন হয়েছে।

গৌড়ের মাংস্যন্যায় পর্বের কাহিনি এই উপন্যাসের বিষয়। মাংস্যন্যায় পর্বের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় লেখক তারই উপর রক্তমাংসের আবরণ দিয়ে কাহিনি গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের তথ্যগত বিচুতি ঘটাননি, গুণগত রূপকে পরিস্ফুট করেছেন। আগেই বলা হয়েছে সামাজিক ইতিহাসের প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে কাহিনির আকার দিয়েছেন।

বজ্র এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার জীবনকে অবলম্বন করেই এ কাহিনি গড়া হয়েছে। তার জীবনাভিজ্ঞতাই এ উপন্যাসের বিষয়। কিন্তু কাহিনিকে সে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেনি। তার জন্ম থেকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত সবটাই আকস্মিকভাবে তার জীবনে এসে পড়েছে। মানবদেব এবং রঙনার বিবাহ আকস্মিক, তার কর্ণসুবর্ণের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়া আকস্মিক—রাজা হওয়াও আকস্মিক। ভালো উপন্যাসে জীবনের উপস্থাপনা যে ভাবে হয়—তা এখানে হয়নি। সবটাই ‘হলেও হতে পারত’—ধরণের বিন্যাস। যেভাবে বিস্মাধর বটেশ্বরের ছলনায় বজ্র ভুরিবসুর জাহাজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা আকস্মিক নয়—কিন্তু নাবিকদের সমবেত আক্রমনের মুখে বজ্র যেভাবে সবাইকে ধরাশায়ী করে ভাগীরথীতে বাঁপ দিয়েছে—তা একালের জনপ্রিয় সিনেমার নায়কের মতো। আবার ভাগীরথীর স্নোতের টান কাটিয়ে কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে পৌঁছানো সেই আকস্মিকতার চূড়ান্ত। কাহিনিতে বজ্র চরিত্রটি নিতান্তই টাইপ শ্রেণির। শবরের আতিথ্য তাকে মুঝ করেছে কিন্তু নগরের কোনো প্রভাব তার উপরে পড়েনি। রাণী শিখরিণীর রূপ দেখে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কুহর কামনা তাকে স্পর্শ করেনি, তবে তার মধ্যে সে একটি মমতাময়ী রূপ লক্ষ করেছে। এ উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রগুলিও একমুখি ও টাইপধর্মী। শিখরিণীর ভোগ মুখিনতা, বিস্মাধরের কৌতুক প্রবণতা থেকে অঙ্গদচুরির ফন্দি, বটেশ্বরের শৌণ্ডিক প্রকৃতি, কোদণ্ড মিশ্রের কুড়ি বছর ধরে প্রতিশোধ নেবার বাসনা, কোকবর্মার শিখরিণীকে পাওয়ার লোভ—সেই একমুখী চরিত্র প্রবণতাকেই প্রকট করে। স্বল্প পরিসরে বরং চাতক ঠাকুরের চরিত্রটি ভালো হয়েছে। গ্রামের অন্য মানুষগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট এবং গ্রামের বর্ণনার মধ্যেও কোনো বিশেষত্ব নেই। উপন্যাসের কাহিনিও মৌরীনদীর স্নোতের মতো একমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। মৌরী যেমন ভাগীরথীতে পড়েছে কাহিনিও তেমনি বেতসগ্রামে শুরু হয়ে কর্ণসুবর্ণে গিয়ে পৌঁছেছে। গ্রাম অরণ্য নগর এই তিনি পর্যায়ে কাহিনিতে বজ্রের অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে। তার বিন্যাসে কোনো অভিনবত্ব নেই। লেখক উপন্যাসের নাম রেখেছেন ‘গৌড়মল্লার’। ‘মল্লার’ বর্ষার ভাবযুক্ত রাত্রিকালীন রাগিনী। শশাক্ষের মৃত্যুর পর শতাব্দী ব্যাপী যে অন্ধকার বাংলায় সমাজ রাজনীতি ও

জনজীবনকে আচছন্ন করে রাখে—‘মল্লার’ রাগিনী তারই দ্যোতনা করে। শশাক্ষের মৃত্যুর পর মানদেব গৌড়ের ভাগ্য নির্ধারণে কৃত্তি দেখাতে পারেননি। ভাস্করবর্মা ও দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেননি। ভাস্করবর্মার পর জয়নাগ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন জানা যায় না। কিন্তু লুটেরা সৈন্যদের রাজনৈতিক কারণেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেননি। ফলে সাধারণ বাঙালির জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। হর্ষবর্ধন মারা গেছেন, ভাস্করবর্মা মারা গেছেন। তাঁদের হাতে শশাক্ষের রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল। ভাস্করবর্মার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। হর্ষবর্ধনের রাজ্যও তাঁর মন্ত্রি দখল করেছেন (R.C. Majumdar, usurpation of his kingdom by his minister, p. 80)। এর মধ্যে তিব্বতের রাজা শ্রোং-সান-গাম্পো, চীনের ওয়াং হিউসেন-সে পূর্বভারত আক্রমণ করেন এবং রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রকৃত পক্ষে বাংলার ভাগ্যে শাস্তি শৃঙ্খলা এবং স্থায়ী রাজবংশের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি। সেদিক থেকে ‘গৌড়মল্লার’ নামটির সার্থকতা আছে।

‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাস হুণ আক্রমণের পটভূমি, ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে শশাক্ষের পর গৌড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গৌড়শক্তির বিনাশ দেখানো হয়েছে। ‘তুমি সন্ধ্যার মেষ’ উপন্যাসেও আসন্ন বিদেশি তুকী আক্রমণের ছায়া লক্ষ করা যায়। লেখক এই উপন্যাসের শুরুতেই এই অন্ধকারের কথা তুলেছেন :

“‘৮৯৯ শকাব্দে সাবক্তগীণ আসিয়া লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। ৯২০ শকাব্দে আসিলেন মামুদ গজনী। ৯৪৬ হইতে ৯৪৮ শকাব্দে মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১১১৫ শকাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। মহারাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।’”<sup>৩০</sup>

ভারত ইতিহাসের এই পটভূমিকায় লেখক ভারতের রাজন্যবর্গের অস্তর্কলঙ্ঘ, অনেক্য এবং আত্মস্তরিতার কাহিনি রচনা করে দেখাতে চেয়েছেন—বিদেশি শক্তির কাছে ভারতবর্ষের পরাধীন হবার প্রকৃত কারণ কী ছিল। তখন সারা ভারতে স্ফন্দণপ্রের মতো কোন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন না যিনি এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। উত্তর ভারতের রাজারা ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। পূর্ব এবং মধ্য ভারতের রাজন্যবর্গের বিরোধ এবং অনেক্যের একটি ইতিহাস সম্মত পটভূমিকা রচনা করে তিনি তুকী আক্রমণের কাছে পদানত বঙ্গদেশের আগতপ্রায় অন্ধকার যুগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

এ কাহিনি লেখা হয়েছে নয়পাল ও চেদিরাজ কর্ণের বিরোধকে অবলম্বন করে। গৌড়ের পাল সম্রাটদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ ও কলচুরি রাজাগণের দীর্ঘ কালের শক্রতা চলে আসছিল। মহীপালকে এই পরাক্রমশালী রাজাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাজ্য রক্ষা করতে

হয়েছিল। মহীপালের পুত্র নয়পাল ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ বা লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে তাঁকে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। শরদিন্দু তাঁর কাহিনিতে এই বিরোধকেই অবলম্বন করেছেন। এই বিরোধ এবং বিরোধ শেষে মিত্রতা এই উপন্যাসের কাহিনি। উপন্যাসের শুরু হয়েছে ‘শকাদের দশম শতকে’ ভারতের ভাগ্যাকাশে সূর্যাস্তের কথা দিয়ে। শকাদের দশম শতক সবক্তগীণ লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তখন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে রাজত্ব করতেন জয়পাল। তিনি রহিংগত তুর্কী মুসলমান শক্তিকে বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু বারবার পরাজিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে তখন একাধিক আঘঢ়লিক রাজশক্তি রাজত্ব করছিল। তাদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করছেন। প্রতিহার রাজারা ছিলেন মুসলমানদের শক্তি কিন্তু রাষ্ট্রকৃটেরা ছিলেন মুসলমানদের সহযোগী। জয়পালের পুত্র অনঙ্গপাল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। পৃথীরাজ চৌহান তরাই এর যুদ্ধে পরাজিত হলে কনৌজের জয়চন্দ্র আনন্দোৎসব করেছিলেন। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধই ছিল এই রাজাদের রাজকার্য—সেই জন্যই রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হত। প্রজা সাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যপূর্ণ। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন তা ঐতিহাসিকের কথা “On account of their mutual Jealousies, rivalries and conflicts the nobles brought ruin to their country.”<sup>১</sup> পশ্চিম ভারতে যখন তুর্কী মুসলমানরা অধিকার বিস্তার তখন পূর্ব ভারতের বা মধ্য, দক্ষিণ-অন্যান্য প্রান্তের রাজারা কেউ সে বিষয়ে সতর্ক হতে পারেননি। উপন্যাসে দেখি এই অগণিত নিশ্চিন্ত রাজন্যবর্গের অনৈক্য এবং বহিরাগত শক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতার অভাব পীড়িত করেছে অতীশ দীপক্ষরকে। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিঘ্ন হয়েছেন। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটি দীপক্ষরের উদ্বিঘ্নতা, বিজাতীয় বিদেশি শক্তির আক্রমণের মোকাবিলা করার উপায় চিন্তা, রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা এবং শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার মত অন্ত সন্ধান করবার চেষ্টার কথা দিয়ে গড়ে।

দীপক্ষ সম্পর্কে শরদিন্দু ইতিহাসের তথ্যের প্রায় কোনো পরিবর্তন ঘটাননি। ১৮০/১৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিক্রমণিপুর মণ্ডলে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা বিহারে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (জাভা) বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির কাছে বারো বছর শাস্ত্র চর্চা করেন। তারপর সিংহল হয়ে মগধে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স ৪৩/৪৪ বছর। সেটা ১০২৩/২৫ খ্রিস্টাব্দ। মহীপাল (১০৮৮-১০৩৮) বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীপক্ষর<sup>২</sup> -কে বিক্রমশীল মহাবিহারের মহাচার্য নিযুক্ত করেন। তাঁর ৪৩ বছরে তিনি মগধে

ফেরেন। ১৮২ খ্রিস্টাব্দকে তাঁর জন্ম ধরলে (রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮০ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন) ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মের সহস্রবার্ষিক জন্মোৎসব হয়) তিনি ১০২৩-১০২৫ খ্রি. মহীপাল কর্তৃক মহাবিহারে মহাচার্য হন। ১৫ বছর তিনি বিক্রমশীল বিহারে কাটিয়েছেন। অনুমিত হয় তিনি ১০৩৮ খ্রি. ৫৮ বছর বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন। সেদিক থেকে দেখলে তিনি মহীপালের রাজ্যকাল মাত্র এদেশে কাটান। ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে মহীপালের পুত্র নয়পাল রাজসিংহসনে আরোহন করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তিব্বতি সূত্র ধরে বলেন তিনি ১৫ বছর এই বিহারে ছিলেন। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি সূত্র ব্যবহার করে ইংরেজিতে ভারত তিব্বত প্রসঙ্গ নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এই বই এর সারাংশ সংকলন করে বাংলায় অতীত দীপঙ্কর সম্পন্নে একটি বই লেখেন। সেই বইতেও তিব্বতি সূত্র অনুসরণ করে বলা হয়েছে তিনি ১৫ বছর মগধে কাটান। এক্ষেত্রে তিনি ১৮২ খ্রিস্টাব্দকে দীপঙ্করের জন্ম সাল হিশেবে গ্রহণ করেছেন। তাহলে দাঁড়ায় তিনি ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান। উপন্যাসে পাই কাহিনি আরঙ্গের সময় দীপঙ্করের বয়স ৬০ বছর, তিনি ১৮ বছর বিক্রমশীল বিহারে মহাচার্য পদে অধিষ্ঠিত। শরদিন্দু নিশ্চয় অন্য কোনো ইতিহাসের সূত্র ব্যবহার করে থাকবেন। তবে একটা কথা বলা দরকার। রমেশচন্দ্র মজুমদার তিব্বতি ঐতিহ্য অনুসরণ করে বলেন দীপঙ্কর ৭৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ৭৩ বছর পরমায়ুর কথা অনেকেই স্মীকার করেন। ১৮০ সালকে জন্ম সন ধরলে তিনি ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। কিন্তু ইতিহাসের বইগুলিতে যেভাবে তার জীবৎকালের ঘটনাগুলিকে সাজানো হয়েছে তাতে মোট ৭১ বছরের খবর পাওয়া যায়। যথা—

জন্ম : ১৮০/১৮২

- |    |  |
|----|--|
| ১৯ | বছর বয়সে ওদন্ত পুরীর আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে দীক্ষা                      |
| ১২ | বছর তীর্থকর থাকার পর ৩১ বছরে সুবর্ণ দ্বীপে ধর্মকীর্তির কাছে পড়ার জন্য যান |
| ১২ | বছর অধ্যয়ন করে ফিরে আসেন  |
| ১৫ | বছর ভারতে বাস  |
| ১৩ | বছর তিব্বতে কাটান; সেখানেই মৃত্যু  |

মোট ৭১ বছর বছর তিব্বতে কাটান :

যদি ধরা যায় আরও দুবছর তিনি ভারতে থেকে গেছেন তাহলে তাঁর বয়সের একটা হিশেব পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে তিনি ৫৮ বছরে নয়—৬০ বছরে তিব্বত যান। শরদিন্দু সেই হিশেব ধরেছেন। ১৮২ খ্রিস্টাব্দকে তাঁর জন্ম সন ধরলে ১০৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ তিনি তিব্বতে যান। তাঁর

মৃত্যু হয় ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

এইভাবে দেখলে তিনি দুবছর বা তিনি বছর নয়পালের রাজ্যকালে মগধে ছিলেন। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রার কাল হিশেবে ১০৩৮—১০৪২ পর্যন্ত পাঁচ বছরের কাল সীমা ধার্য করেছেন। নানা কারণে রমেশচন্দ্র মজুমদার কলচুরি রাজ গাঙ্গেয় দেবের মহীপালের বিরোধ ১০২৬ এর ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন সময় শুরু হয়েছিল বলে মনে করেন। কারণ ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দে বেনারসের অধিকার মহীপালের হাত থেকে কলচুরিরাজের হাতে চলে যায়।

ঐতিহাসিকদের স্বীকৃত ধারণা হ'ল গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন যদিও কেউ কেউ ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যভার গ্রহণ হয়েছিল বলে মনে করেন। ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে নয়পাল বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ এর আগে থেকেই চলছিল। গাঙ্গেয়দেব সন্ত্বত পাল রাজাদের পরাজিত করেছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের হাতে পরাজিত হন। শরদিন্দু এই যুদ্ধের কথা প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন। উপন্যাসে পাই ‘লক্ষ্মীকর্ণের পিতা গাঙ্গেয়দেব এবং নয়পালের পিতা মহীপাল অক্ষাত্তভাবে সারা জীবন পরম্পর যুদ্ধ করেছেন। লক্ষ্মীকর্ণ মধ্য বয়সে রাজা হয়ে এই যুদ্ধ ব্রত বজায় রেখেছিলেন। অন্যপক্ষে উপন্যাসের বর্ণনানুসারে যুদ্ধের প্রতি নয়পালের বিত্যণ ধরে গিয়েছিল। তিনি শাস্তি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ মগধ আক্রমণ করলে তিনি লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু ইতিহাস পাই কর্ণ প্রথমে নয়পালকে পরাজিত করেন।<sup>১০</sup> (R.C. Majumdar, This is the generally accepted view thong, p. 145) লক্ষ্মীকর্ণের যে অনুশাসন বীরভূমের পাইকরে পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় তিনি পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। উপন্যাসে কিন্তু যুদ্ধের এই বিবরণ পাওয়া যায় না। শরদিন্দু লক্ষ্মীকর্ণকে কিঞ্চিৎ স্থূল বুদ্ধির মানুষ হিশেবে এঁকেছেন। যদিও তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁকে ‘ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধির লোক’ থেকে একটু উদ্বার করি :

কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয় পালকে পরাজিত করেন। তিনি পাল রাজধানী অধিকার করিতে পানের নাই, কিন্তু অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া মন্দিরের দ্রব্যাদি লুঁঠন করেন। প্রসিদ্ধ আচার্য অতীশ অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে এই যুদ্ধ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু পরে যখন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করিয়া কলচুরি সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে ছিলেন, তখন দীপঙ্কর কর্ণ ও তাহার সৈন্যকে আশ্রয় দেয়। তাঁহার চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘ স্থাপিত হয়। (R.C. Majumdar, This is the generally accepted view thong, Mr. J.C. Ghosh places it in 1039 A.D., p. 144)<sup>১১</sup>

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৪, পৃ. ৭২) তিব্বতি সূত্র থেকেই একথা ব্যবহার করা হয়েছে। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি সূত্র অনুসরণ করে অতীশের সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে এই কথাই পাওয়া যায়। নয়পালের সৈন্য বাহিনি প্রথমে পরাজিত হয় কিন্তু রাজধানী দখল করতে পারেনি। পরে মগধ রাজের জয় হয়। প্রথমে নয়পালের পরাজয়ের সময় দীপক্ষর কোনো উদ্যোগ নেননি, লক্ষ্মীকর্ণ পরাজিত ও নয়পালের হাতে তাঁর সৈন্যদল পর্যন্ত হলে তখন তিনি শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তিব্বতি ঐতিহ্য অনুসারে রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন নিজের স্বাস্থ্য এমনকি জীবন বিপন্ন করেও তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। (RC Majumdar, P. 145) উপন্যাসিক শরদিন্দু লক্ষ্মীকর্ণের জয়লাভের কথা বলেননি। বরং তিনি প্রথম থেকেই তাঁর যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্বলতা দেখেছেন। নয়পালের হাতে পরাজিত লক্ষ্মীকর্ণের ছবিই তিনি এঁকেছেন। যুদ্ধের প্রথমে লক্ষ্মীকর্ণের জয়ের কথা (it seems that at first Karna defeated Nayapala, p. 144) বলেননি। লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের রাজধানী দখল করতে পারেননি। তবে তারা বিহারের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এতেও দীপক্ষর বিচলিত হয়নি। উপন্যাসে কাহিনিটি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসে পাই নয়পালের জিঘাংসু সৈন্যদের হাতে পীড়িত লক্ষ্মীকর্ণকে দীপক্ষর আশ্রয় দেন। উপন্যাসে লক্ষ্মীকর্ণ দীপক্ষরকে বলেছেন খাদ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তাঁরা বিহারে ঢুকেছেন। একদল শ্রমণ দীপক্ষরকে জানিয়েছেন সৈন্যরা অন্ধকোষ্ঠ লুঝন করেছে। একথা ইতিহাস এবং উপন্যাস দুক্ষেত্রেই আছে। ইতিহাসে অতীশ কর্ণের সৈন্যদের রক্ষা করে তাদের অন্যত্র পাঠিয়েছেন। কর্ণ অতীব শ্রদ্ধায় অতীশের ভক্তে পরিণত হয়েছেন। অতীশকে নিজ রাজ্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ‘‘অতীশকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে তিনি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন’’<sup>৩৪</sup> অতীশ দীপক্ষর কর্ণের রাজধানী ত্রিপুরী গিয়েছিলেন—এরকম একটা ইঙ্গিত আছে। এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তিব্বতি বিবরণে একটি কথা আছে। দু-পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে অতীশকে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। ‘‘Unmindful of his health even at the risk of his life Atisha again and again crossed the rivers that lay between the two kingdoms.’’<sup>৩৫</sup> বহুবার উভয় রাজ্যের মধ্যেকার নদী পারাপার করা, নিজের স্বাস্থ্যের কথা না ভেবে বহু শ্রম স্বীকার করে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা এই কথার মধ্যে যে টুকু বোঝা যায়—তাতে অতীশ দীপক্ষরের পক্ষে কলচুরি রাজ্যে যাওয়া অসম্ভব নয়। উপন্যাসে লক্ষ্মীকর্ণ জোর করে বিহার ভূমিতে অধিষ্ঠান করেছেন। তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা নেই তিনি ‘ব্যাঘ-চক্ষু’ মেলে দীপক্ষরকে দেখেছেন। উপন্যাসে তিব্বত থেকে আগত শ্রমণেরা অগ্নিকন্দুক ফাটিয়ে কর্ণের সৈন্যদের

ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছেন। লক্ষ্মীকর্ণ তিব্বতি শ্রমণদের পিশাচ মনে করে ভয় পেয়েছেন এবং দীপক্ষরের শরণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলচুরি রাজ কর্ণের সঙ্গে পাল রাজ নয়পালের শাস্তি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে বিগ্রহপালের সঙ্গে যৌবনশ্রীর বিবাহের প্রস্তাব ছিল কিনা জানা যায় না—তবে শরদিন্দু উপন্যাসে এই শর্তটিকে ঢুকিয়ে রেখেছেন। এখানে একটি-দুটি প্রসঙ্গ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত দীপক্ষর শ্রীজ্ঞানের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার চিন্তা। উপন্যাসে পাই দীপক্ষর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বিদেশি বিজাতীয় তুর্কীদের আক্রমণ নিয়ে চিন্তিত। ‘তিনি বুবিয়াছিলেন এই বিধর্মী দুর্বভূতগুলাকে সময়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তাহারা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিবে।’ এরা যে তুর্কী যোদ্ধা সে কথাও বলা হয়েছে। ‘তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই।’ দীপক্ষর দেখছেন দেশে শক্তিমান রাজা নেই, শক্ত বিতাড়ণের উপযুক্ত অস্ত্রও নেই। এখানে একটি প্রশ্ন বিচার যোগ্য। দীপক্ষর দুই রাজবংশের মধ্যে শাস্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন কেন? এরকম উদ্যোগ অন্য কোনো ধর্মাচার্য নিয়েছেন কিনা বলতে পারি না। ভারতের প্রাদেশিক শক্তিগুলি তখন পারস্পরিক যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করে চলেছে। বহিঃশক্তির সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগ নেই। উপন্যাসের প্রথমে দেখি দীপক্ষর তুর্কী আক্রমণের বিষয়ে চিন্তি তিনি শক্তিমান রাজা শক্তিশালী অস্ত্র সম্পদ করছেন। পাল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। নয়পাল তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন না কিন্তু কলচুরি রাজবংশের পরাক্রম তখনো অবশিষ্ট আছে। কলচুরি রাজবংশের মিত্রতা লাভ করতে পারলে মগধের পক্ষে বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। এটা দীপক্ষরের চিন্তায় থাকা সম্ভব। শরদিন্দু উপন্যাসে শুরুতেই বলেছেন পূর্ব ভারতে তখনো একটু আলো ছিল। দুর্মদ আততায়ীর আক্রমণের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন দীপক্ষর একাধিক রাজশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারতকে শক্ত মুক্ত রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি শক্তিমান রাজা খুঁজছিলেন। দুই রাজবংশের সম্মিলিত রাজশক্তি সেই শক্তি। শক্ত বিতাড়ণের নৃতন অস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি ভাবছিলেন। যদি অলৌকিক অস্ত্র থাকত তবে ক্লেচ্ছদের তাড়ানো যেত। দীপক্ষরের এরকম কঞ্চনা বিলাসের মধ্যেই এসেছেন রত্নাকর শাস্তি। তিনি তিব্বতি দূতদের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তিব্বতি দূতদের মধ্যে মুখ্য হলেন ট্রিল খ্রিম গ্যালবা ভারতীয় নাম বিনয় ধর। এই নাম একটু ভিন্নভাবে পাওয়া যায়। অলকা চট্টোপাধ্যায় তিব্বতি ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলে এই নামটিকে লিখেছেন ছুল-ঠিম-জলবা। ইংরেজি ‘প্র’ বণ্টি এক্ষেত্রে তিব্বতিতে গ উচ্চারিত না হয়েছে ‘জ’ উচ্চারিত হয়েছে। তবে শরদিন্দু এই নামটির ভারতীয় রূপ দিয়েছেন বিনয়ধর; অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় রূপ দিয়েছেন জয়

শীল। তবে দীপক্ষরের এই ভক্তি শিয়টিই তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যান। শরদিন্দু সন্তুষ্ট রমেশচন্দ্র মজুমদারের তথ্য অনুসরণ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— “Tshul khrim gyalwa, also known as Vinaydhara ... proceeded to Vikramasila with the mission.”<sup>৩৭</sup>

শরদিন্দু ইতিহাসের তথ্য অনুসরণ করে লিখেছেন তিব্বত রাজ লাহ-লামা-মে-শেস দীপক্ষকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। এখন তাঁর ভাতুস্পুত্র চান-চুব রাজা হয়েছেন। তিব্বতে ধর্মের সংস্কার ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চান। রাজা লাহ-লামা মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাও তাঁরা সঙ্গে এনেছেন। এই বর্ণনা ইতিহাস সম্মত। তিব্বত রাজ লাহ-লামা ইতিপূর্বে তাঁর জন্য সোনা উপটোকন পাঠিয়েছিলেন দীপক্ষক তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রাজা লাহ-লামার শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদে তিনি বিচলিত হন এবং তিব্বতে যেতে সম্মত হন ‘‘Dapankara was very much moved when he heard the news of the king’s death under tragic circumstances. He consented to pay a visit to tibet ...’’<sup>৩৮</sup> কিন্তু উপন্যাসে এই তথ্যের সঙ্গে একটি কাঙ্গালিক বৃত্তান্ত যুক্ত হয়েছে। বিনয়ধর এবার উপটোকন হিশেবে কিছু অগ্নিকন্দুক এনেছেন। ‘‘বিনয়ধর পেটিকা হইতে একটি গোলক তুলিয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—আর্য এর নাম অগ্নিকন্দুক। চীন দেশ থেকে কারুকর আগিয়ে আমাদের রাজা এই কন্দুক নির্মাণ করিয়েছেন। এর সাহায্যে আপনি বিধর্মী তুরস্কদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারবেন।’’ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ.২৭৩) এই উপন্যাসের প্রথমে দীপক্ষক তুরস্কদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে চিহ্নিত ছিলেন। সেই চিহ্নার সঙ্গে মিলিয়ে এই অগ্নিকন্দুকের কঙ্গনা এসেছে। অগ্নিকন্দুকের সম্বন্ধে অন্য তথ্যটি ঠিক। চীন দেশেই এই জিনিস প্রথম আবিষ্কৃত হয়। চীন দেশ থেকেই তা অন্যান্য দেশে যায়। ৭ম শতাব্দীতেই তাঁ রাজাদের আমলে চীনে এই ধরণের অগ্নিকন্দুক নির্মাণ হয়। তখনো তা সর্ব সাধারণের হাতে পৌঁছায়নি। লেখক এই কথাটি মনে রেখে গল্পে এই কন্দুকের কথা যুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত তুর্কী আক্রমণ সম্বন্ধেও এঁদের সচেতনতার খবর পাওয়া যায়। সবক্তব্যগীণ ও তাঁর পুত্র মামুদ উত্তর পশ্চিম ভারতে জয় পালের রাজ্য আক্রমণ করে ভারতে ঢুকে পড়েছে। এ খবর বোধ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের অনেকে জানতেন। রঞ্জাকর শাস্তি ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের প্রধান হিশেবে (Chief of the monastery)। শরদিন্দু ও সেকথা লিখেছেন। দীপক্ষরের তিব্বতে যাওয়ার কথা শুনে রঞ্জাকর বলিলেন—‘অতীশ, তুমি যদি তিব্বতে যাও তিব্বতে ধর্মের দীপ জুলে উঠবে, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অগণ্য তুরস্ক সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। তিব্বতিদের মধুর বাক্যে সে কথা ভুলে যেও না।’

ইতিহাসে পাই Ratnakar discarded the idea. কিন্তু যখন তিনি বুঝেছেন দীপঙ্কর তিব্বতে যেতে ইচ্ছুক তখন তাঁকে যেতে বাধা দেন নি। তিনি তিনি বছর পরে তাঁকে ফিরে আসতে বলেছেন।  
রাত্নাকর শান্তি বলেছেন—

“Without Atish India will be in darkness. He Holds the key of many Institutions. In his absence many monasteries will be empty. The looming sign prognosticate evil for India. Numerous Turushks (Muham-madans) are invading India, and I am much concerned at heart.”<sup>১১</sup>

এখানে যে তথ্য আছে উপন্যাসে হ্রস্ব তারই রূপায়ণ ঘটেছে। অগণ্য আক্রমণকারী তুরঙ্কসেনার কথা তিব্বতি যাত্রাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। বিহারে নয়পালের সঙ্গে পরামর্শের দীপঙ্কর বলেছেন “বর্বর তুরঙ্কদের বিতাড়িত করতে হলে এই বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন।” (পৃ. ২৪৫) বিনয়ধর দীপঙ্করকে বলেছেন এই অগ্নিকন্দুকগুলি ক্রীড়ার সামগ্ৰী মাত্ৰ। এর চেয়ে শতগুণ ভীষণ অস্ত্র তাঁরা নির্মাণ করতে জানেন।” বিনয়ধর যে কন্দুকগুলি নিয়ে এসেছেন সেগুলির চেয়ে আরো শক্তিশালী বিস্ফোরক টীনে আবিষ্ট হয়েছে। উপন্যাস অনুসারে দীপঙ্কর সেই বিস্ফোরক নির্মাণের কৌশল শিখতে তিব্বতে যাবেন। দীপঙ্কর তিব্বতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য গেলেন। তিনি গৃতবিদ্যা শিক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। শরদিন্দু লিখেছেন এ সম্বন্ধে “ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।” শরদিন্দু কোনো ইতিহাসের সূত্রে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কথা জেনে দীপঙ্করের এই অস্ত্র শিক্ষার কথা লিখেছেন বলে জানা যায় না। তবে একটা কথা বলা দরকার। ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাস থেকে তিনি নৃতন অস্ত্রের কথা বলেছেন। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসেও নৃতন অস্ত্রের কথা আছে। মনে হয় কাহিনিতে এরকম অভিনবত্ব সৃষ্টির দ্বারা বিশ্বয়রসের সৃষ্টি কথা শরদিন্দুর সৈন্ধিত।

প্রথম পরিচ্ছেদে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হ'ল আগে বলা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল রাজ্য দুটির মধ্যে সম্প্রীতি সাধন করে শক্তি সঞ্চয় করা। দীপঙ্করের দিক থেকে তাই ছিল উদ্দেশ্য। নয়পাল তেমন শক্তিধর ছিলেন না, যুদ্ধ অপেক্ষা পাশা খেলায় তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। কিন্তু লক্ষ্মীকৰ্ণ ছিলেন রণ দুর্মদ। তাঁর শান্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দীপঙ্কর তাঁকে যে সাহায্য করেছেন—তাকেও সরাসরি নস্যাং করতে পারেননি। ইতিহাসে দীপঙ্করের চেষ্টায় উভয় পক্ষের সন্ধির কথা আছে। দীর্ঘকাল ধরে পাল রাজাদের সঙ্গে কলচুরি রাজাদের যে যুদ্ধ চলে আসছিল এতে সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু এ সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। “The treaty was merely an interlude, and karna once move directed his arms against the

palas during the reign of Vigrahapala III (1055-1070)”<sup>৪০</sup> লক্ষ্মীকর্ণ ইতিমধ্যে পরমার এবং চান্দেলাদের পরাজিত করে মহানদীর উপত্যকা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি বিগ্রহ পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। বঙ্গ এবং গৌড়ের রাজারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন (R.C. Majumdar, p. 146) কর্ণ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম পর্যন্ত যে অগ্রসর হয়েছিলেন বীরভূমের পাইকরে প্রাপ্ত লিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

“in this second expedition, too, karna, inspite of initial success, ultimately suffered defeat. কর্ণ শেষ পর্যন্ত গোড় জয় করে উঠতে পারেননি।

এবারও সন্ধি করতে বাধ্য হয় perhaps a peace was concluded, and the alliance was cemented by the marriage of karna’s daughter with vigrahapal III.”<sup>৪১</sup>

প্রথম সন্ধি নয়পালের রাজত্ব কালে ১০৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে; দ্বিতীয় সন্ধি ও যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহের বিঝে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দের পরে। ইতিহাসের এ দুই ঘটনাকে একটি কাহিনি প্রবাহের মধ্যে জুড়ে লেখক উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থনা করেছেন। ইতিহাসের তথ্য মোটের উপর ঠিক আছে কেবল উপন্যাসের প্রয়োজনে তার মধ্যেকার কালসক্ষেত্র ঘটেছে। দ্বিতীয়ত কাহিনিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার জন্যে ইতিহাসের তথ্যের মধ্যে রস সঞ্চার করতে হয়েছে। তাতে অবশ্য বিগ্রহ বা লক্ষ্মীকর্ণ কারো রাজ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। ইতিহাসে যৌবনশ্রীর বিবাহের সম্বন্ধে কোনো বিবরণ নেই। উপন্যাসিক দীপক্ষরের মুখ দিয়ে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার সঙ্গে বিগ্রহের বিবাহের প্রস্তাব করিয়েছেন। বিগ্রহ তখন মাত্র কুড়ি বছরের যুবাপুরুষ; লেখক বলেছেন “সুন্দর কান্তি যুবা, রাজবংশেও এমন সুপুরুষ দুর্লভ।” দীপক্ষর দেশে শাস্তিরক্ষা চান তাই মৈত্রীর কথা বলেন। দুই রাজবংশের মৈত্রী হলে রাষ্ট্রের কল্যাণ। লক্ষ্মীকর্ণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং কন্যার স্বয়ম্ভুর সভার উদ্যোগ করবেন বলেছেন। সেই সভায় তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাবেন বলেছেন। এটা অবশ্য লক্ষ্মীকর্ণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। তিনি অচিরেই প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করবেন।

ইতিহাস যেখানে নীরব, উপন্যাসিকের কল্পনা সেখানে কাহিনি নির্মাণ করে ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ করে। ইতিহাসের ক্ষীণ এবং আপাত বিচ্ছিন্ন কাঠামোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে নব প্রতিমা নির্মাণ করে। এই কাহিনি নির্মাণের ক্ষমতাশূন্যকে বিশ্বাস্য করে গড়ে তোলবার প্রতিভা শরদিন্দুর ছিল। পাল রাজবংশের সঙ্গে কলচুরি বংশের লক্ষ্মীকর্ণের দু’বার যুদ্ধ এবং সন্ধি হয়। এইটুকু ইতিহাসের কাঠামো। তার মধ্যবর্তী তথ্য কিছুই নেই। এই মধ্যবর্তী অংশ শরদিন্দুর গড়ে

তোলা।

প্রথম সন্ধির শর্ত হিশেবে দীপক্ষর বিগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহের কথা তুলেছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ সে প্রস্তাবে রাজি হননি; তিনি তাঁর বংশের বহু পুরুষানুক্রমে আগত কন্যা স্বয়ম্ভরের কথা বলেছিলেন। দীপক্ষর তখন শর্ত দিয়েছিলেন স্বয়ম্ভর সভায় বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীর স্বয়ম্ভর সভার আয়োজন করেছেন ঠিকই কিন্তু বিগ্রহকে আমন্ত্রণ জানাননি। কাহিনি এখানে ইতিহাস ছাড়িয়ে উপন্যাসের নিয়মে চলেছে। অনাহত বিগ্রহ বন্ধু অনঙ্গপালের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোশলে যৌবনাকে হরণ করে আনতে ত্রিপুরী রাজ্যে যাবেন ঠিক করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জুড়ে এই যাত্রার বর্ণনা। কিন্তু কেবল যাত্রার বর্ণনায় উপন্যাস হয় না, তাই যাত্রা পথে জাতবর্মা ও তাঁর স্ত্রী বীরশ্রীর কথা আনতে হয়েছে এবং কন্যাহরণ করে বিবাহ করবার উদ্যোগে জাতবর্মা ও বীরশ্রীর সম্মতি ও সহযোগিতা লাভের কথা বলা হয়েছে। আপাত বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ কাহিনি এইভাবে উপন্যাসের কাহিনির উদ্দীপনা ও কৌতুহল মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরী রাজ্য স্বয়ম্ভর উপলক্ষে প্রথম এসে পৌঁছেন জাতবর্মা ও বীরশ্রী। স্বয়ংবর লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা যৌবনাকে নিয়ে এঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন। এইখানে যৌবনশ্রীর প্রথম বিগ্রহকে দেখেন এবং একবার দেখেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। বিদ্যাপতির উপমা ব্যবহার করে শরদিন্দু যৌবনার মনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন “মেঘমালার ভিতর দিয়া তড়িল্লতার মত অঙ্গাত অপরিচিত মানুষ হাদয়ে শেল হানিয়া দিয়া চলিয়া যায়, অন্তর্লোকে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়।” রাজকুমারী যৌবনশ্রীর মনে বিগ্রহের মূর্তি এই শেল বিদ্ধ করে ইন্দ্রজাল ঘটিয়ে গেল। যৌবনশ্রীর এই চিন্তাখণ্ড্য কাহিনিতে নায়ক নায়িকার মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে। যৌবনশ্রী বিগ্রহকে দেখা মাত্র মুঝ হয়েছে; বিগ্রহ যৌবনাকে হরণ করবার উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরী এসেছে। নায়ক নায়িকার মধ্যে আর্কষণ দেখা যাচ্ছে কিন্তু মিলনের পথে বাইরের বাধা। আগেকার প্রেম কাহিনিগুলির সমস্যা ছিল এইরকম। বাইরের লোকজন, সমাজ শাসন, অভিভাবকদের নিয়েধ—এই সবই ছিল সে প্রেমের মিলনের সমস্যা। আধুনিক প্রেম কাহিনিতে বাইরের লোকজন বা সমাজ শৃঙ্খলা ততো বড়ো হয় না—বাধা হয়ে ওঠে নায়ক নায়িকার ব্যক্তিত্বের মাত্রা। শরদিন্দুর ‘কুমার সন্তবের কবি’ উপন্যাসেই কেবল নায়িকার অভিমান বড়ো হয়ে মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্য কোনো উপন্যাসে এরকম হয়নি। বাইরের বাধাকেই নানা উপায়ে অতিক্রম করে মিলনের পথ করে নিতে হয়েছে।

বিগ্রহ ও যৌবনার মিলনের পথে বাধা রাজা কর্ণের অহঙ্কারবোধ; অশ্বিতাবোধ। নয়পালের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলচুরি বংশের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব

লক্ষ্মীকর্ণের অহংকার। তিনি বিগ্রহকে কন্যার পাণিগ্রহীতা হিশেবে স্বীকার করতে চান না। এই বিরাট বাধার বিপরীত দিকে সহযোগী হয়ে কাজ করেছেন বীরশ্রী ও জাতবর্মা এবং লক্ষ্মীকর্ণের মা অম্বিকাদেবী। বিগ্রহ এবং যৌবনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে। সেখানে বীরশ্রী তাদের সহায়ক। এরপর রাজপুরীর উদ্যানে ও তাদের দেখা হয়েছে। শরদিন্দু এ ক্ষেত্রে রাজপুত্র ও রাজকন্যার অনুরাগকে একালের উদ্যানকেন্দ্রিক প্রেমিক প্রেমিকার কলণ্ডঞ্জনের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। সেকালের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে অনৃতা রাজকন্যার পক্ষে পরদেশী যুবকের সঙ্গে বৃক্ষ বাটিকায় প্রণয় সম্ভাষণের কোনো অন্তরায় রাখেননি। রাজপুরী থেকে পুরনারী বা দুই রাজকন্যার জন্য অন্তঃপুর রক্ষি দলের অন্তরায় রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। রক্ষি পরিবৃত অন্তঃপুরের উদ্যানে পরপুরুষের প্রবেশ পথে কেউ বাধা দেয়নি। নায়ক নায়িকার প্রেম এই নির্বাধ পরিবেশে আবেগ মথিত হয়ে উঠেছে। এদিকে রাজা বিগ্রহকে অপমানিত করবার জন্য যে ফন্দি করেছেন তাতে অনঙ্গ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারেনি। লক্ষ্মীকর্ণের শিল্পিরা কেউ বিগ্রহের চিত্রপট দেখেনি—চর্মচক্ষে তো দেখেইনি। লক্ষ্মীকর্ণ কোন শিল্পিকে মগধে পাঠিয়ে বিগ্রহের সাক্ষাৎ পরিচয় নেবার কথাও ভাবেননি। কাজেই অগঙ্গই এখানে একমাত্র শিল্পি যে চোখ বন্ধ করেই বিগ্রহের মূর্তি গড়তে পারে। আর তারই সহযোগিতা করবার জন্য হঠাত চিন্তিত অনঙ্গের সম্মুখে মধ্যাহ্ন-আহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বান্ধুলি। বজ্র অঁটুনির মধ্যে বিস্ময়কর ফাঁক থেকে গেছে। কাজেই লক্ষ্মীকর্ণের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়েছে বটে, মর্কট মূর্তি-বিগ্রহ স্বয়ম্বরে বসেওছে, কিন্তু সেই বেতের কাঠামোর ভিতর থেকে যথাসময়ে বেরিয়ে এসেছে বিগ্রহ, যাকে যৌবনা মালা দিয়েছে। লেখক এক্ষেত্রে জয়ঁচাদের কন্যা সংযুক্তার সঙ্গে পৃথীরাজের পরিণয় প্রসঙ্গের কথা তুলেছেন। তাঁর মতে সেকালে রাজাদের মধ্যে এই ধরণের নষ্টামি প্রচলিত ছিল। বিগ্রহপাল যৌবনাকে চুরি করে নিয়ে যাবেন ভেবেই এসেছিলেন। কিন্তু যৌবনা এ অপহরণ প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেননি। তাই স্বয়ম্বর পর্যন্ত যেতে হয়েছে। বিগ্রহের গলায় মালা দেবার পর স্বয়ম্বর সভায় অগ্নিকন্দুক ছুঁড়ে সভাকে বিভ্রান্ত করেও বিগ্রহ কিন্তু যৌবনাকে নিয়ে যেতে পারেন নি। লম্বোদর তাকে ঘোড়ায় উঠতে দেয়নি। এটা কাহিনির দিক। শরদিন্দু এই পর্যন্ত কাহিনিতে বাইরের বাধার সঙ্গে অন্তরের বিরোধকে জুড়ে দিয়ে এই কাহিনির দ্বন্দ্ব গড়ে তুলেছেন। রাজকুমারী যৌবনার আত্মর্যাদা এবং বিগ্রহপালের র্যাদা সম্বন্ধে যে বোধ তাই সহজ সমাধানের রাস্তায় তাকে যেতে দেয়নি। অন্য পক্ষে ইতিহাসের দিক থেকেও তো বাধা ছিল। কারণ রাজকন্যার স্বয়ম্বর হয়েছে কিনা ইতিহাসে তার বিবরণ নেই, কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যে দ্বিতীয়বার পাল রাজ্য আক্রমণ করে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েও পরাজিত হন সে প্রমাণ আছে। সম্ভ্যাকর নন্দীর

‘রামচরিত’ অনুসারে শেষ পর্যন্ত বিগ্রহপাল কর্ণকে পরাজিত করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—“Karna, inspite of initial success, ultimately suffered defeat”<sup>৪২</sup> কাজেই ইতিহাসের সত্ত্বের কারণেই বিগ্রহপালের পক্ষে তখনই যৌবনাকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না—লম্বোদর কাহিনিতে এই নিমিত্তের ভাগী মাত্র।

রোমাসের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল জটিলতা দানা বেধে ওঠার আগেই তাকে লয় করে দেবার রাস্তা পাওয়া যায়। এখানে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা প্রধান রচনার পার্থক্য। বাস্তবে যা ঘটা দুঃখের রোমাসে তা অনায়াস, এজন্য রোমান রচনায় কাহিনি বাস্তবিকতা অপেক্ষা লয় কল্পনা চারিতা অনুসরণ করে চলে। কাহিনির পরম্পরাক্রম একটা থাকে কিন্তু তাতে ঘটনা বিন্যাসের যুক্তি অনেকটা লয়চারী। শরদিন্দুর এই উপন্যাসে প্রথম জটিলতা তৈরি হয়েছিল যৌবনার আত্মর্যাদা বোধের উচ্চারণে। আর দ্বিতীয় জটিলতা দেখা গেল রাজা লক্ষ্মীকর্ণের ক্ষেত্রে ফলে যৌবনশ্রীর গৃহান্তরীণ হওয়ায়। লক্ষ্মীকর্ণ মাঝের কৌশলটি বুঝতে পারলেন (এতদিন পারেননি কেন? তাঁর কি শুপ্তচরেরা ঠিক খবর দিতে পারে নি?) এবং যৌবনাকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। ফলে বিফল মনোরম বিগ্রহকে একাই ফিরে যেতে হল। ইতিহাসের সঙ্গে সংপৃশ্যহীন বলে অনঙ্গের অবশ্য বাস্তুলিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি। ইতিহাসে দেখতে পাই বিগ্রহপালের রাজত্বকালে লক্ষ্মীকর্ণ আবার পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। বিগ্রহপাল (তৃতীয়) ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। ১০৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ বা তার পরবর্তী কোন সময়ে এই যুদ্ধ হন। এই মধ্যবর্তী সময়ে লক্ষ্মীকর্ণ ‘পরমার’ এবং ‘চান্দেলা’ দের পরাজিত করে অনেক শক্তি সংগ্রহ করেন। কলচুরি রাজবংশের তথ্য অনুসারে বঙ্গরাজ লক্ষ্মীকর্ণের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত চুকে পড়েছিলেন। কিন্তু ‘রামচরিত’ অনুসারে বিগ্রহ লক্ষ্মীকর্ণকে পরাজিত করেন। যৌবনশ্রীর সঙ্গে বিগ্রহের বিবাহ হয়। কাহিনিতে দ্বিতীয় যুদ্ধ নয়পালের রাজত্বকালেই ঘটেছে। এবং এই যুদ্ধ উপন্যাসে ঠিক যুদ্ধ হয়নি অনেকটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ছবি হয়েছে মাত্র।

লক্ষ্মীকর্ণ পাল রাজ নয়পাল এবং (মর্কট?) বিগ্রহপালকে শায়েস্তা করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেছেন। যুদ্ধে বৃদ্ধ মা এবং ‘স্বয়ম্ভুরা’ কন্যাকে ও নিয়ে এসেছেন। সেকালে অবশ্য এরকম ব্যাপার অসম্ভব ছিল না। রাজারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সপরিবারে যাত্রা করতেন। কেননা ক্ষম্বাবারই ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। কিন্তু যুদ্ধ কেবল দুপক্ষের শিবির সংস্থাপনের মধ্যেই আটকে রইল। আর দুপক্ষের সৈন্যই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রাস্তিদেব রাজাকে বলেছিলেন এখন যুদ্ধ যাত্রার সময় নয়, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ তা শোনেননি। পথশ্রমে ক্লান্ত পালরাজের সৈন্যবাহিনীকে বিশ্রামের সময় না দিয়ে তিনি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু ‘নৈখত হইতে যমদুতাকৃতি

মেঘ” এবং “প্রমত্ত ঝাঁঝাবাত” এসে তাঁর উদ্যমকে বিফল করে দিল। একথা ঠিক যে প্রাকৃতিক দুর্ঘাগে বহু রাজা যুদ্ধে অভিষ্ঠেত ফললাভ করেননি। বৃষ্টির ফলে কর্দমাঙ্গ ভূমিতে পুরুর সৈন্যরা ধনু স্থাপন করে যুদ্ধ করতে পারেনি। প্রচণ্ড তুষার ঝাঁকার ফলে সুবুক্ত গীনের বিরুদ্ধে ১৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে জয়পালের সৈন্যরা দাঁড়াতে পারেনি, ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রচণ্ড নিদাঘ ঝাঁঝায় উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধে হারিয়ে বসে রইল। এই প্রাকৃতিক দুর্ঘাগের মধ্যে এসে পৌঁছলেন বীরশ্রী, বঙ্গালদেশের রাজা জাতবর্মার স্ত্রী। তারপর উপন্যাসে যে ঘটনা ঘটল তা নিতান্ত বালকোচিত, মনোহারি এবং ‘সিনেমাটিক’। আফিম খাইয়ে সৈন্যবাসের রক্ষীদের ঘূর পাড়িয়ে যৌবনশ্রীকে অপহরণ কেবল রোমাসের বা রূপকথার জগতেই ঘটে। এবং শেষ পর্যন্ত যেভাবে দুর্দান্ত পরাক্রমী লক্ষ্মীকর্ণ কন্যাও জামাকে নিজের ক্ষেত্রে তুলে তাণ্ডব নর্তন করলেন তা একবার মাত্র শরদিন্পুর ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসেই ঘটেছে। বর্ণণ বৎস বঙ্গাল দেশে কিছুকাল রাজত্ব করে। ভোজবর্মার ‘বেলাব’ তান্ত্র শাসন থেকেই এ বৎশের সম্মতে জানতে পারা যায়। (R.C. Majumdar, p. 197) এঁরা সিংহপুরের যাদব বৎস। সিংহপুরকে বর্তমান হগলীর সিঙ্গুর বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র ‘মহাবৎস’ অনুসারে এই সিংহপুর থেকেই বিজয়সিংহ লক্ষ্মণ গিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সিংহপুরকে কলিঙ্গদেশের কোন স্থান বলে মনে করেন। কীভাবে এই কলিঙ্গদেশের যাদব বর্ণণার বঙ্গালদেশ দখল করলেন তা জানা যায় না। কিন্তু যা জানা যায় তা হল জাত বর্মাই বঙ্গালদেশে এই বৎশের প্রতিষ্ঠা করেন। ‘বেলাব’ অনুশাসনে বলা হয়েছে জাতবর্মা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। অঙ্গ কামরূপ বরেন্দ্র তিনি জয় করেছিলেন। জাতবর্মার জন্য যে গৌরব দাবি করা হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অঙ্গদেশ দখল করেন বিদ্রোহী দিব্যকে পরাজিত করে বরেন্দ্রী দখল করেন। কিন্তু বহিরাগত জাতবর্মার এই যুদ্ধ জয়ের গৌরব ঐতিহাসিকেরা মেনে নেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ...he accompanied the kalchuri king karna in his expedition against Bengal. কলচুরি রাজকর্ণের একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে তিনি পূর্ব দেশীয় একটি রাজ্য ধ্বংশ করেছিলেন। এ থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন কলিঙ্গ দেশীয় জাতবর্মা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন জাতবর্মার পিতা বজ্র বর্ণণ রাজেন্দ্র চোল, জয়সিংহ (২য়) বা গাঙ্গেয়দেবের যেকোনো একজন বৈদেশিক রাজাকে বাংলাদেশ আক্রমণে সহায়তা করেছিলেন। কলচুরি রাজগণ্ডের অধীনে অঙ্গ গৌড় ও বঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই সুযোগে বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।<sup>১০</sup> শিলালিপির প্রমাণানুসারে রাজ কর্ণ বঙ্গের এক রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। সেটা সম্ভবত চন্দ্রবৎস। চন্দ্রবৎস ধ্বংস করে কলচুরি রাজ জাতবর্মাকে সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে

থাকতে পারেন। তিনি যে অঙ্গ বরেন্দ্র কামরূপ রাজ্যজয়ের কথা বলেছেন তার অর্থ এই কলচুরি  
রাজবংশের সহায়তাকারী হিশেবে যুদ্ধে যোগদান ও কলচুরি রাজাদের জয়কে নিজের জয় বলে  
স্বীকার করা।

এখন আমাদের বিবেচ্য উপন্যাসে জাতবর্মার রূপ অঙ্গিত হয়েছে তাকে কতখানি ইতিহাস  
সম্মত বলা যায়? জাতবর্মার সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রথম যুদ্ধের সময় কলচুরি-রাজকর্ণের সঙ্গে  
যুদ্ধে এসেছেন। অর্থাৎ ইতিহাসে যে কথা বলে-জাতবর্মা কলচুরি রাজকে যুদ্ধে সহযোগিতা  
করেছিলেন—সেই ভূমিকায় জাতবর্মাকে দেখতে পাই। জাতবর্মা তখন বিবাহিত, হাসিখুশী যুবা-  
বয়স্ক। কিন্তু দ্বিতীয় বার যুদ্ধে তিনি লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করেছিলেন  
কিনা বলা যায় না। এর বিপক্ষে ও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তবে ভোজবর্মার ‘বেলাব’ অনুশাসন  
অনুসারে তিনি অঙ্গদেশের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এর অর্থ পাল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ  
বোঝায়। শরদিন্দু পালরাজ ও কলচুরি রাজের দ্বিতীয় যুদ্ধে জাতবর্মাকে পালরাজের সহায়তা  
করবার কথা লিখেছেন। উপন্যাসে রাজা বজ্র বর্মাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, রাজপুত্র জাতবর্মা  
তখন যুবরাজ মাত্র। ইতিহাসে জাতবর্মাই বঙ্গদেশে বর্মণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। “Vajravarman,  
the first ancester named in the grant, is not referred to as King.” বেলার তান্ত্র  
শাসনে যেভাবে জাতবর্মার উল্লেখ আছে তাতে রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন জাতবর্মাই এ  
রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডি.সি. গাঞ্জুলি অবশ্য লিখেছেন  
বজ্রবর্মাই এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শরদিন্দু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস অনুসরণ  
করে ছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বজ্রবর্মা কুমার জাতবর্মাকে প্রতিভূত করে একশত রণহস্তী দিয়ে কলচুরি  
রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন। এটা ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। জাতবর্মার  
সঙ্গে বিগ্রহ পালের মৈত্রীর সংবাদও ইতিহাসে নেই। তবে জাতবর্মা বিগ্রহপালের রাজ্যের অংশ  
দখলকারী বিদ্রোহী বরেন্দ্র নেতা দিব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

‘কুমারসন্তবের কবি’ উপন্যাসটির মর্মমূলে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বয়ং লেখক শরদিন্দু  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মানসতার পরিচয় জানা অবশ্য কর্তব্য। তা না হ'লে তাঁর সাহিত্যিক  
দৃষ্টি ভঙ্গি ও সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে। বাংলায় যখন তিনি  
বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ফ ঠিক সে সময়ই বাংলার বাইরে বসে বাংলা  
সাহিত্যের ভাগীরকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিত  
সমালোচকগণ (কতিপয় ব্যতীত) শরদিন্দুর সাহিত্য সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের  
লেখা ও তাঁর জীবনাদর্শের অনুসারী হলেও কবির হাতে ‘কেউ কেউ’<sup>৪৪</sup> শরদিন্দুর লেখা তুলে

দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। শরদিন্দুর দেওয়া চিঠির উভরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“আমার অসুস্থ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার সেক্রেটারীরা সন্তুষ্ট আপনার বই আমাকে দেন নাই।”<sup>৪৫</sup> উল্লেখ্য, কতিপয় সমালোচক ছাড়া আজ পর্যন্ত শরদিন্দুর মতো সাহিত্যিকের সঠিক মূল্যায়ন কেউ করেননি। এটা বাঙালি সমালোচক ও সাহিত্যিকদের অবহেলা উপেক্ষার বিষয়, না তাঁরা জানতেনই না যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন প্রবাসী বাঙালি বাংলা সাহিত্য নামক প্রদীপের নীচে বসে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যাইহোক, শরদিন্দুর মানসলোক ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক অধ্যায়ে বিষদভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে শরদিন্দুর সাহিত্যিক মানসিকতা সম্পর্কে দু’-একটি কথা তুলে ধরা হ’ল—“আমি সাহিত্যিক, কোনও ism-এর ধার ধারিনা। Realism, Romanticism প্রভৃতি বাক্যে আমার কাছে সমান নিরর্থক। আমি গল্প রচনা করে পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বর্ধম। কাউকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই, গল্পলেখার ব্যপদেশে Socialism, Marxism প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করারও আমার কাজ নয়। আমি জীবনকে যতটুকু বুঝেছি, জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করেছি সেইটুকুই আমার পাঠকদের পরিবেশন করেছি।

মনুষ্য জীবনের অপার বৈচিত্র্য আমাকে মুঝ করেছে, মানুষের অতীত ইতিহাস আমার কাছে অনির্বচনীয় রসের ভাণ্ডার।”<sup>৪৬</sup> তিনি জানতেন রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। তাই সাহিত্যকে রসসত্য করে তুলতে যেমন সাহিত্য-সাধনা করতেন তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন নৃতন নৃতন। কখনো ইতিহাস, কখনো মানুষের মন, কখনো সাহিত্যের সত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নিরস্তর চিন্তা করতেন। এরকমই চিন্তা-প্রসূত একটি উপন্যাস হ’লো ‘কুমার সন্ত্বের কবি’। কালিদাস ও তাঁর সমসাময়িক জীবনেতিহাস নিয়ে রচিত এটি। বিশেষ করে কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে এই লেখাটিতে। কালিদাসের সমসাময়িক ইতিহাসের ক্ষেত্রে লেখক কালিদাসকে দেখেছেন। আসলে কালিদাস সম্পর্কে লেখকের কৌতুহল আগাগোড়াই। কেননা, তিনি ‘অষ্টম সর্গ’ নামেও কালিদাস সম্পর্কিত একটি ইতিহাসান্তি ছোটগল্প লিখেছেন। আমরা ছোটগল্পের অধ্যায় বিশ্লেষণে তার বিষদ ব্যাখ্যা ও বিচার করেছি। প্রচলিত আছে যে—

‘হায়রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।

পণ্ডিতেরা বিতর্ক করে লহে তারিখ সাল।।’<sup>৪৭</sup>

সত্যিই এই বিতর্ক থেকেই শরদিন্দু কালিদাসকে নিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। নানা মিথ বা গালগল্প, কল্পনা বা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ইতিহাসের নীরবতা ও সত্যাসত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। কালিদাসকে নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য রয়েছে তথ্যভিঞ্জ ও পণ্ডিত মহলে। এমনকি

তার লেখাগুলিও বিতর্কের ঘড় থেকে বাদ পরে যায়নি। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সময়ের মহাকবি। কিন্তু কালিদাস আগে, না শুদ্ধক আগে সে বিতর্কও কিন্তু কম নয়। লেখক তাঁর ‘কুমারসন্ধবের কবি’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন মূর্খ নিরক্ষর গ্রামীণ কালিদাস কী করে সভাপঞ্জিত ও কবি হয়ে উঠলেন তারই অপরূপ বর্ণনা। কুমারী রাজকন্যা হৈমবতীর তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতে পূর্বশর্ত মতো রাজকন্যা তার গালায় বর মাল্য পরিয়েছেন। বাসর রাতে রাণীর হাতে ‘মৃচ্ছকটিকম’ দেখে মুঞ্চ হয়েছেন। কিন্তু কালিদাস জানতেন না বইটির নাম কি, কার লেখা? তখনও কালিদাস মূর্খ ও নিরক্ষর। তাহলে প্রশ্ন হ'ল সমস্ত বিশারদ কালিদাস সম্পর্কে সময়কাল নির্ণয় করে বলেছেন যে, শুদ্ধকের পূর্বের কবি হ'ল কালিদাস। অনেকে আবার শুদ্ধককে কালিদাসের পূর্বে স্থিত করতে চেয়েছেন। আর এই অবকাশে বা কালিদাস সম্পর্কিত নানা মুণ্ডির নানা মতকে হাতিয়ার করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুদ্ধককেই কিন্তু কালিদাসের পূর্বে স্থিত করেছেন। যদিও এটি বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু শরদিন্দুর মতের নিরিখেই আমরা ‘কুমারসন্ধের কবি’ বা ‘অষ্টম সর্গ’ উপন্যাস ছেটগঙ্গের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব। ইতিহাসের কাল নির্ণয় ঐতিহাসিকের কাজ। সাহিত্যিক ও ইতিহাসের পাঠক হিশেবে শরদিন্দু তাই ইতিহাস ও সাহিত্য মিলে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। স্বভাবতই ইতিহাসের নিরিখে আমরা কালিদাসের মহাকবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বিশদ ভাবে বিচার ও ব্যাখ্যা করব। ‘অষ্টম সর্গ’ নামক গল্পটি ইতিহাসের একটু ছোঁয়া থাকলেও সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে কালিদাসের দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র। এবং তাঁর সমকালীন জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা। পাশাপাশি সাহিত্যিক বিতর্ক কথাও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসটিকেও কিন্তু ইতিহাসের খানিক ছোঁয়ায় রচিত কালিদাস তাঁর সমসাময়িক জীবনালেখ্যের দলিল বললেও অত্যন্তি করা হবে না। ‘অষ্টম সর্গ’ ও ‘কুমারসন্ধবের কবি’ রচনা দুটি পাশাপাশি রেখে আমাদের আলোচনা করবার কারণ হ'ল ‘কুমারসন্ধবের কবি’তে কালিদাসের কাঠুরে থেকে কবি হওয়ার কথা, ঘটনাচক্রে কুস্তলরাজ কুমারী হৈমবতীর সঙ্গে বিবাহ, বিবাহের রাত্রিতেই কুস্তল রাজ্যের ত্রিসীমানা থেকে বের করে দেওয়া ও তৎপরবর্তী দুঃখময় জীবন বর্ণনা ইত্যাদি পুঞ্জানুভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ‘অষ্টম সর্গ’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে কালিদাসের বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য জীবনে কালিদাসের প্রতি অবিশ্বাস, সংশয়, দ্বন্দ্ব সমকালীন জীবনের প্রেক্ষিতে পরিস্ফূট করা হয়েছে। বলা যায়, উপন্যাসটিতে তার জীবনের প্রথম পর্ব ও গল্পটিতে দ্বিতীয় পর্ব ত্রুটি পরমপরায় বিধৃত হয়েছে।

আর একটি বিষয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন পাঠকের নজরে এনেছেন যা পরীক্ষামূলক কিছুটা আবার বিতর্কিত। উল্লেখ্য, বিষয়টি হ'ল ‘মৃচ্ছকটিকম’ নামক নাটকটি উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য

ভাবে ব্যবহার করা। এর কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। এবার তা বিচার করা যাক। আলোচ্য উপন্যাসটি বিষয়বস্তু হ'ল—কাঠুরে কালিদাসের জগৎ বিখ্যাত কবি হ'য়ে ওঠা। আবার কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার পেছনেও একটি কাহিনি রয়েছে। কাহিনিটি এরকম—কৃষ্ণল রাজকন্যা হৈমশ্বীর স্বয়ংবর সভা। স্বয়ংবর সভা উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হয় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আমন্ত্রণ। তবে স্বয়ংবর সভার একটি শর্তও রয়েছে। রাজকুমারী কৃত তিনটি প্রশ্নের সঠিক দিতে পারবে তারই গলায় রাজকুমারী বরমাল্য দেবে। সে হিশেবে রাজা ও রাজ্যের বাইরের রাজকুমার, সামন্ত, শ্রেষ্ঠ ও কয়েকজন নাগরিক রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে লজ্জায় মুখ ঢেকে ফিরে গেছেন। লেখকের বর্ণনায়—“উহু উনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তেরোজন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দ জন শ্রেষ্ঠপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল ?”<sup>৪৮</sup> এরপরে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজের পালা। যুবরাজ মকরবর্মা। সে এক আশ্চর্য কাহিনি। যুবরাজ মকরবর্মা কৃষ্ণল রাজসভার দিকে রহনা দিয়েছেন। ঘুরপথে তার রাজমন্ত্রি কর্মচারীরা রহনা দিয়েছেন। কিছুটা বেশী সময় লাগবে বলে যুবরাজ সোজা পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছেন। পথে ক্লান্তি অনুভব করে জঙ্গলে মধ্যেখানে একটি জলাশয় দেখে জল পান কিংবা স্নান করবেন বলে দাঁড়িয়ে পড়েন। ইতস্তত এদিক ওদিক দেখে ঘোড়া থেকে নামতেই দেখতে পান একটি সুন্দরকাণ্ডি বছর কুড়ির যুবক যে গাছের শাখায় বসে আছে তারই মূলে কুঠারাঘাত করছে। যুবকটির মুখে শিশুর সরলতা, মুখের হাসি নব-বিস্ময় ও কৌতুকভরা, মনে হয় যেন কোনো দৈব শিশু। সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বিন্দুমাত্র আছে বলে অনুমান হয় না। যুবরাজ বিস্ময় ভরে দেখে তাকে প্রশ্ন করে তুই কে রে? সরল ভাবে হাসি মুখে বলে, আমি কালিদাস। যুবরাজ পুনরায় প্রশ্ন করে কৃষ্ণল রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস? কালিদাস বলে হেঁটে গেলে একদিন লাগবে। কালিদাস আবার তার বেশভূষা দেখে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? যুবরাজ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গের সুরে বলে—আমি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকর বর্মা। কালিদাস গ্রামীণ। সে ভাবতেই পারেনি রাজপুত্র দেখবে। কালিদাসের কৌতুহল বেড়ে গেল। মন্ত্রির কোটাল সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বলেও যুবরাজ তাকে জানায়। কালিদাসের ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। বলে তুমি কি স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছ। যুবরাজ ইঙ্গিতে জানালেন হ্যাঁ। তারপর একে একে শিরস্ত্রাণ, রাজপোষাক খুলে ঘোড়ার পিঠে রেখে নাইতে নামতেই কালিদাস এক এক করে শিরস্ত্রাণ, জুতা জোড়া এবং রাজবেশ পরে ফেলেছে। ওদিকে যুবরাজ আপন মনে স্নান করছিল। সজ্জিত হয়ে কালিদাস পুনরায় শাখাটি কাটতে শুরু করে দিয়েছে। ঘোড়াটি শব্দ শুনে অস্তির হয়ে পড়ে। মুহূর্তে অনেক ব্যাপার ঘটল। শাখাটি ভেঙে কালিদাস ঘোড়ার পিঠে পড়াতেই ভয়ে বল্লা

বাঁধন ছিঁড়ে ঘোড়াটি দৌড়াতে শুরু করে দিল। এমনি কালিদাস ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে বনে নিথর হয়ে পড়ে রইল। ঘোড়া ছুটছে দেখে উৎকর্ণ হয়ে যুবরাজ ব্যাপার বুঝতে পেরে জল থেকে উঠে এসে চিংকার করেও লাভ করতে পারল না। নির্জন বন মধ্যে কে শোনে। ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। নগর পার হয়ে ছঁশ করে দোকানের উপর দিয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক দৃষ্টি করে ঘোড়াটি গিয়ে পৌঁছাল কুস্তলরাজের প্রাসাদ দ্বারের সামনে। এমনি দু'জন বলবান রক্ষী ঘোড়াটিকে ধরায় প্রবীণ মন্ত্র এসে বলে আসুন! মহারাজ আসুন! শুভাগতম! শুভাগতম! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কালিদাস ব্যাপার বুঝে নির্মত্ত্ব। সে ভেবে পাচ্ছে না যে সে কী বলবে। মহামন্ত্রি কালিদাসকে রাজকুমারী হৈমবতীর ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে রাজকুমারী সুসজ্জিত ঘরে সথিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সহাস্যালাপ করছিলেন। এমন সময় মহামন্ত্রি কালিদাসকে নিয়ে হাজির। তাকে দেখে সকলে বিস্মিত। রাজকুমারীও বিস্মৃত। এত সৌন্দর্য! এত রূপবাণ যুবরাজ সে কখনো দেখেনি। যাইহোক, মহামন্ত্রি রাজকুমারীকে সচেতন করে দিয়ে বললেন— সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকর বর্মা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করেন। তখন রাজকুমারী বিস্ময়ের ঘোর থেকে মুক্ত হয়ে একে একে তিনটি প্রশ্ন করলেন। তবে এই পর্বে হাসির অবতারণা করতেও লেখক ভুলে যান নি। ‘পদদ্বন্দ্ব’ শব্দ নিয়ে কালিদাসের কৌতুহল অভাবনীয়। কারণ সে গ্রামীণ এত অর্থ বুঝবে কী করে। যাইহোক রাজকুমারীর তিনটি প্রশ্ন যথাক্রমে—

১. জগতে সবচেয়ে শক্তিমান কী?

২. দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে? এবং

৩. পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্টি কি?

এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়াতে কিন্তু রাজকুমারী আর্য নীতি-রীতি মেনেই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মনে করে কালিদাসের গলায় বরমাল্য দেন। সে যে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ নয়, সে যে কালিদাস। মূর্খ, নিরক্ষর, গ্রামীণ তা রাজকুমারী জানেন না। তা দু-একবার কালিদাসের কথায় ও আচরণে প্রমাণিত হলেও কিন্তু রাজকুমারী পরিহাস বলে মনে ভেবেছেন। বলেন সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ বুঝি পরিহাস প্রিয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুকোশলে কালিদাসের আচরণে অসঙ্গতি দেখিয়েছেন। কারণ চরিত্রির বাস্তবতা রক্ষিত হবে না। উঠ প্রসঙ্গে, রাজপুরীর প্রহর বাজানোর সময় এবং যখন রাজকুমারী শয়ন ঘরে কালিদাসকে নিয়ে তখন কালিদাসের ব্যবহার চরমে ওঠে। শুধুমাত্র কালিদাস যখন রাজকুমারীকে বলে—“ওহো—বুঝেছি, রাত দুপুর হয়েছে। এবার চল, ভেতরে যাই।”<sup>৪৯</sup> শয়ন ঘরের বর্ণনায় কাহিনি চরমে ওঠে। কুলুঙ্গির মধ্যে থরে থরে সাজানো পুঁথি দেখে কালিদাস বিস্মিত হয়। ভাবে এত পুঁথি! তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। কারণ ভালো জিনিস

দেখলে তার স্বাদ হয় কিছু একটা করতে। কালিদাস ব্যগ্রভরে সকৌতুকে বললে—‘তুমি সব পড়েছ’? হৈমন্তী তার কথায় সায় দিলেন। কালিদাসের মুখে স্নান হয়ে গেল। উপন্যাসে উল্লেখ্য শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিকম্’<sup>১০</sup> নামে যে পুঁথিটি হাতে নিয়েছিল সোটি রাখতে রাখতে বিষণ্ণ মুখে বলল—“আমি একটিও পড়িনি। যদি পড়তে পারতাম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর নিশ্চয় বলতে পারতাম।”<sup>১১</sup> কুমারী হৈমন্তী বিবর্ণ মুখে শুষ্ক হাদয়ে বলে উঠল পরিহাস করবেন না আর্যপুত্র! আপনি তো সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কালিদাস কৌতুক সুরে বললে—‘কিন্তু আমি তো রাজপুত্রুর নই! হৈমন্তীর মাথায় আকাশ ভাসিয়া পড়িল—রাজপুত্র নয়! তবে— কে আপনি? কালিদাস বলিলেন—আমি কালিদাস—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলাম, এমন সময়— হৈমন্তী বুদ্ধিভূষিতের মত বলিলেন— কাঠ কাটছিলেন! কাঠুরে! তবে তুমি সত্যিই বর্ণ পরিচয়হীন মূর্খ?’<sup>১২</sup>

আর এখানেই উপন্যাসের চরমতম মুহূর্ত। হৈমন্তী যেন এক মুহূর্তে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যেন মাকাল ফল। বাইরে সুদৃশ্য, ভেতরে ফাঁপা। কালিদাস যেন রাজকুমারী হৈমন্তীর কাছে তাই। কিন্তু কী হবে! রাজকুমারী কিন্তু ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না।

এমন সময় মকর বর্মার প্রবেশ। শূলে দেব! শূলে দেব! চিৎকার করতে করতে সভায় প্রবেশ। কুস্তল রাজসভায় প্রবেশ করে মহারাজের সামনে চিৎকার করে বলেন—আমিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকর বর্মা। ঢোরটা আমার ঘোড়া ও রাজমুকুট পোষাক নিয়ে পালিয়েছে। চুরি করেছে। যুবরাজ নিজের দেশের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ। কোনো রকম বুঝিয়ে বাঁকে রাতে খাওয়া ও শোয়ার উন্নত বন্দোবস্ত করা হ'ল। কারণ অপরাধী তাঁদের জামাতা। অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে। এখন কি হবে? মহারাজ কোনো উপায় না পেয়ে মহামন্ত্রীর সঙ্গে গোপন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয় কালিদাসকে রাজ্যের ত্রিসীমা থেকে বের করে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গভীর রাতে তাকে রাজ্যের ত্রিসীমার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনি হল কালিদাসের কবি হয়ে ওঠার কাহিনি ও পুনর্মিলন অংশ।

এরই মাঝখানে সখীদের কৌতুহল, নাচ, গান, রঙ্গ তামাসা, সর্বোপরি রাজকুমারীর সখি মালিনীর কৌতুকহাস্য, সহজ সরল প্রীতিপূর্ণ আচরণ, কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। কবি কালিদাসকে রাজপুরীতে রাণী ভানুমতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কাব্যপাঠ, রাজসভায় প্রকাশে কাব্য পাঠ, কালিদাস থেকে মহাকবি কালিদাস হয়ে ওঠা, পরিশেষে বিবাহিত পত্নী হৈমন্তীর সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিবাহান্তে মিলন। এই পুনর্মিলন যার জন্য সন্তুষ্ট হয়েছে সে কবির মনের মালিনী। মালিনীর প্রসঙ্গে কিন্তু ‘কালের মন্দিরা’ উপন্যাসের সুগোপা ও কুল (যদিও কুল সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র),

‘গোড়মল্লারে’ বাঞ্ছুলির চরিত্র মনে এসে যায়। তবে বাঞ্ছুলি, মালিনী আর সুগোপা সত্যিই অনবদ্য সংষ্ঠি। এই তিনটি নারী চরিত্র অঙ্গে শরদিন্দু (তথাকথিত রাজকুমারীদের সংখি কিংবা ফুলচয়নিকারা) দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই তিনটি নারী যেন আমাদের আকর্ষণ করে শরদিন্দুর উপন্যাস পাঠে। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য ছোটগল্প উপন্যাসেও এরকম বহু চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই—যারা সত্যিই শরদিন্দুর সহানুভূতি কুড়িয়েছে পাঠকের হৃদয় জয় করেছে।

যাইহোক, পুঞ্জানুপুঞ্জ বিচার ও বিশ্লেষণ এই উপন্যাসটিকে হয়তো শরদিন্দুর অন্যান্য প্রধান উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট জায়গা দখল করবে এটাই প্রত্যাশিত। উপন্যাসটির মধ্যে আমরা কালিদাসের জীবনকে দু'টি পর্বে ভাগ করেছিলাম। পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পর্ব নিয়ে আলোচনার পর আমরা বলতে পারি, প্রথম পর্বটি কালিদাসের মহাকবি হয়ে ওঠার প্রারম্ভিক পর্ব বা প্রস্তুতি পর্ব। লেখক জানেন কালিদাসকে নিয়ে পশ্চিমত্ত্বে নানান কথা ও গালগল্প প্রচলিত। তাই তিনি এভাবেই কালিদাসকে চিত্রিত করেছেন। এতে পাঠকেরও চিন্তাদ্বন্দ্বি কালিদাসেরও কবিত্ব প্রাপ্তি। কী অপূর্ব সুন্দর মোহনীয় করে শরদিন্দু দেখালেন কালিদাসের ভবিত্ব্যৎ জীবন নাট্যকে সন্তান্য অবিশ্বাস্য ঘটনাকে এক ধাক্কায় কবি কল্পনায় বিশ্বাস্য ও সন্তান্য করে তুললেন—এখানেই শরদিন্দুর কবিত্বের ও লেখার গুণ।

পুনরায় আমরা ফিরে যাই ‘মৃচ্ছকটিকম্’ লেখক কেন উল্লেখ করলেন তার কারণ সন্দানে। কারণ হিশেবে আমাদের মনে হয়। এক. শরদিন্দু ‘মৃচ্ছকটিকম্’ এর লেখকে কালিদাসের আগে স্থাপন করতে চেয়েছেন কারণ তিনি জানেন শুদ্রক ও কালিদাসের সময়কাল নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই তিনি সংশয়ের সুযোগ গ্রহণ করে এক অপূর্ব উপন্যাস আমাদের উপহার দিলেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন আর শুদ্রক খঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এখানেই যত গোল। লেখকের পক্ষপাতও কিন্তু শুদ্রকের দিকে। কারণ তিনি দেখাচ্ছেন কালিদাস তখনও নিরক্ষর, মূর্খ—বই লিখবে কী প্রকারে। ‘মৃচ্ছকটিকম্’ লেখাটিও পড়তে জানে না। এছাড়াও শুদ্রক যদি কালিদাসের পরের নাট্যকার হন তবে শরদিন্দু কেন কালিদাস পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস বা অশ্বঘোষের নাটকের নাম উল্লেখ করলেন না। শুদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকটির ব্যবহার কেন করলেন। সেদিক থেকে আমাদের মনে হয় শরদিন্দু শুদ্রককেই কালিদাসের আগে স্থান দিতে চেয়েছেন। যদিও এটা বিতর্কের বিষয়। প্রাচীনকালের কবিদের জন্ম সাল নিয়ে মতান্তর, মনান্তর ও মতান্তেক্য রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দক্ষ আখ্যান নির্মাতা। কেননা, দশ বছর পরে থাকা কাহিনিকেও তিনি একই ধাঁচে, একই রসের আবেদনে রসময় ও রসোভীর্ণ করে তোলেন;

উদাহরণ—‘কালের মন্দিরা’। যাইহোক, সূক্ষ্ম চিন্তানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর আধ্যানগুলিতে। আমাদের বক্তব্য হ'ল লেখক পূর্বেই জানিয়েছেন যে, কুস্তল রাজসভায় রাজকুমারী হৈমন্তীর সয়ংবর সভা হবে। সেখানে চগুল, পামর, নীচ অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশ নিতে পারবে। পূর্বসূত্র হিশেবে আমরা বলতে পারি—

ক. কালিদাস নিরক্ষর গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষ।

খ. ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকটিতেও কিন্তু নাট্যকার শুদ্ধক সাধারণ নিম্নবিত্ত উঙ্গুরিধারী মানুষদের নিয়ে লেখা। অর্থাৎ সেই পটভূমিকে লক্ষ্য রেখেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উঞ্জিখিত নাটকটির নাম উঞ্জেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের মূল কথাবস্তু সঙ্গে বা ফোকালাইসড চরিত্রকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে ‘মৃচ্ছকটিকম্’ নাটকটির ব্যবহার তাঁর কাছে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। যাইহোক, সাহিত্যিক বিতর্ক হয়তো শরদিন্দুর অভিপ্রেত ছিল না। সাহিত্যকে সন্তাবনাময় করে গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতি ও সাহিত্য তাঁর অজানা ছিল না। সেহেতু এ ধরণের প্রশ্ন ওঠাও অহেতুক নয়।

রাজবাড়ীর গণ্ডী পেড়িয়ে কালিদাসের জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সন্তুষ্ট হয়েছে। হয়তো রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও মহিমাপূর্ণ জীবন-যাপন তাঁর মহাকবি হয়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই নাগরিক জীবন ও বিলাসবৈত্তব পরিত্যাজ্য। কুস্তল রাজ বিক্রমাদিত্যও কিন্তু বারবার আমাদের স্মরণ করাতে চেয়েছেন যে, রাজসভায় বসে বসে কবিতা কাব্য উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট হচ্ছেন। তাই তিনি উপস্থিত কবিদের মাঝে মাঝে ভৎসনা করছেন আবার কখনো কখনো কবিদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য অস্তঃপুরে চলে যাচ্ছেন। এতে প্রমাণিত হয়, রাজাধিরাজ সত্যিই রসিক মানুষ। সাহিত্যিক জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট। সাহিত্য বিচার সম্পর্কেও দক্ষ। তাই তিনিও মনে মনে একজন উন্নত প্রতিভাশালী কবি খুঁজছিলেন। কারণ তিনি কবিদের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। কবিরা তো প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো সৃষ্টিশীল। কিন্তু রাজসভার উপস্থিত কবিবর্গ শুধু তো একঘেঁয়েমি ভাবে রাজস্তুতিতেই আবদ্ধ। তাই মহারাজের কাব্যরসপিপাসার ঘাটতি তাঁকে অশ্বস্তিতে ফেলে। অবশ্যে কালিদাসকে পেয়ে কালিদাসের স্বরচিত কাব্যপাঠ শুনে মুঞ্চ হন ও তাকে রাজসভা কবি রূপে মর্যাদা দেন। শরদিন্দুর লক্ষ্য হ'ল প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে কবিদের সমাদর ও মর্যাদা ছিল তার পরিচয় দান করা। মূল কথা হ'ল সুখে কাব্য কবিতা হয় না—কাব্য তৈরি হয় দুঃখে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাসের জবানীতে তা উঞ্জেখ করেছেন—‘অন্তিম চমৎকরা কাতরে কবিতা কুতঃ।’<sup>৩০</sup>

এই উপন্যাসটির শেষপর্বে লেখক নব দম্পতির বিচ্ছন্ন জীবনের কর্মরূপ ও যন্ত্রণার

চিত্র এঁকেছেন। অবশ্য বিচ্ছিন্নতার কারণও বিদ্যমান। রাজকুমারী বিপুল ঐশ্বর্য, বিলাসী জীবন, সহীদাসী পরিবৃত রাজ সুখ, বিদ্যুতি, সাহিত্যানুরাগী বিশেষ করে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মতোই— কথায় বলে বাপকে বেটি, ইত্যাদি উচ্চমার্গীয় জীবন তাকে অহঙ্কারী ও অন্ধ করে তুলেছিলো। ফলত মূর্খ কালিদাসকে সে স্বামী হিশেবে মেনে নিতে পারে নি। তার বেঁধেছে। কোথায় সে আর কোথায় কালিদাস। মূর্খ নিরক্ষর গ্রামীণ! তাকে স্পর্শ করবার সাহস পায় কী করে। ঐশ্বর্যের দাস্তিকতা ও বিদ্যুতিপণায় সে কালিদাসকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কালিদাসের সুন্দর গৌরকাস্তি সহজ সরল রূপ ও মন তার মন থেকে মুছে যায়নি। এমনকি তার পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যও মনে মনে তাকে খুঁজেছে—কিন্তু পায়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তার বিয়ের। সে যোগিনীরূপ ধরেছে। পিতার মনেও শাস্তি নেই। আবার রাজকুমারী মনের দুঃখে পুনরায় বিয়েও করবে না। কারণ প্রথমত, সে বিবাহিতা, দ্বিতীয়ত; তার বিবাহের সন্তুষ্ণনাও কম তদুপরি প্রজা থেকে শুরু করে রাজপুরবাসীগণ কী তাকে ধীক্ষার দেবে না! চিন্তায় উদ্বিগ্নতায় সে দিন কাটাত। বই পড়তো। একদিন কালিদাস নামাঙ্কিত ‘মেঘদুতম’ নামক একটি পুস্তক হাতে পেয়ে পড়লেন। বিষয় কী অপূর্ব! খুব চমৎকার তার মর্মোপলক্ষি। কিন্তু ভাবছেন কোন কালিদাস? সে কী! না সে কী করে হবে! সে তো মূর্খ। আশার চিহ্ন দেখা গেলেও পরক্ষণেই তা মুছে যায়। পিতা পূর্বেই ঐ বইটি আত্মস্তু করেছে। মেয়ের করণ দশা দেখে বলে যক্ষের বিরহে যক্ষিণী কি মর্মাহত। পিতা পুরীতে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা দুর্লভ বিষয় নয়। উল্লেখ্য, গ্রন্থটির বিষয় পরোক্ষে যে হৈমশ্রীকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে তা লেখক সুকোশলে ব্যবহার করেছেন।

আসলে লেখকের বক্তব্য এখানে সহজেই অনুমেয় যে, প্রথমত, প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতেও পতি-পত্নীর সম্পর্ক খুবই শুদ্ধাপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত; পতি পরমশ্রদ্ধার। তৃতীয়ত; একবার স্বামী গ্রহণে অধিকার। চতুর্থত; সেকালে স্বামী পরিত্যক্ত নারীর মূল্য কম ছিলো ইত্যাদি বিষয় কালিদাস ও হৈমশ্রীর বিয়ের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। সে জন্যই হয়তো উপন্যাসের সমাপ্তিতে দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরহের পরেও লেখক তাদের মধুর মিলন দেখিয়েছেন। ঐশ্বর্য, মর্যাদা, রাজভোগ, বিলাসবৈভব, বিদ্যুতিপণা ও বংশগৌরব নদীর তীরে গিয়ে ঠেকেছে যেখানে কালিদাস পর্ণকুটিরে থাকেন। অর্থাৎ ধন সম্পত্তি অহঙ্কার মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রকৃত প্রেমধর্মই মানুষকে পরম তৃপ্তি দেয়। প্রেমই জীবন, অপ্রেমই মৃত্যু। তাই উপন্যাসেও হর-পাবতীর প্রেম, রতির স্বামীর প্রতি ভালোবাসা সাংকেতিকরূপ পেয়েছে।

এই উপন্যাসে লেখক দাম্পত্য সম্পর্কের তুল্যমূল্য বিচার করেছেন। বলা যায়, হর-পাবতীর বিবাহ। পতির নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগও কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কের গভীর প্রেমকেই

দ্যোতিত করে। মদনভম্বের পর রতির বিলাপ আমাদের সহানুভূতির উদ্দেক করে। অপরাপরপক্ষে কালিদাস-হেমশ্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক আমাদের ভাবায়, দৃঢ় দেয় পরিশেষে প্রশান্তি ও মিলন আমাদের তৃপ্তি দেয়। যাইহোক, তিনি জোড়া দাম্পত্য সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে কালিদাস-হেমশ্রীর মধ্যে শরদিন্দু আসলে ভারতীয় তথা বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্গাব্যসূত্র খুঁজতে চেয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন, উচ্চ-নীচ ভাব-ভাবনীয় ফল যে বিষময় তারও সাংকেতিক ব্যঙ্গনায় আমাদের ভাবায় ও সচেতন করে তোলে। আসলে শরদিন্দুর মানসিক ভাবনার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি সকলস্ত্রের মানুষকে ভালোবাসেন। তার পরিচয় কিন্তু আমরা আলোচ উপন্যাসটিসহ প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই পাই।

এই উপন্যাসটিতে ইতিহাস চেতনার পরিচয় যৎসামান্য। কালিদাসের আমলে স্থাপিত এই কাহিনি। কালিদাস নিঃসন্দেহে ইতিহাসের চরিত্র। তবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলতে আমরা যা বুবি, সে অর্থে কালিদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন। বিক্রমাদিত্য ইতিহাসের চরিত্র, সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার ইতিহাসের ব্যক্তি। হৃণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ হুগেদের বর্বরতা ও উৎপীড়নও ঐতিহাসিক ঘটনা। তদুপরি, এসব চরিত্র, ঘটনা নামমাত্র। অনেক ইতিহাসিক গালগঞ্জ ইতিহাসের তুচ্ছ উপাদানগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। আর তাতেই উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠেছে। কারণ ইতিহাসের বাগাড়স্তর নেই, যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, নৈরাজ্য, যড়যন্ত্র, লুঠতরাস, নারীহরণ—এক কথায় যা যা না থাকলে ইতিহাস মনে হয় না—এই উপন্যাসটি তাই-ই। অভূতপূর্ব অপূর্ব কাহিনির সন্ধিবেশে উপন্যাসটি খজু ও একরৈখিক দৃঢ় পিনন্দ হয়ে উঠেছে। এককথায় সত্যিকারের রস সাহিত্য। এই রকম কাহিনি রচনার দিকেই কিন্তু শরদিন্দুর মানসিক ঝোঁক। কারণ তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেন— রসবর্জিত সত্যও সাহিত্য নয়। এই উপন্যাসটিকে সঠিক মূল্যায়ন করে দেখলে যে কোন রসজ্ঞ সমালোচকই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন বলে আমরা মনে করি। উপন্যাসটি পাঠে আমাদের মনে প্রশান্তির ছোঁয়ায় ভরে ওঠে। ক্লান্ত নয়! ক্লান্ত নয়—এক অদ্বুদ মোহাবেশ আমাদের তাড়া করে। ভুলে যাই মর্মর পৃথিবীর বিষয় আশয়ের দুর্নির্বার আকর্যণ—শুধুই মনে হয় প্রেম যুগে যুগে। তাই পরিশেষে মিলনোৎকর্ণ কর্তৃত কালিদাস কৌতুকে বলে—“না, না, তুমি রাজার মেরে।”<sup>48</sup> পরক্ষণে ভেদাভেদ ভুলে রাজকুমারী বলে—“যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।”<sup>49</sup> লেখকের উদ্দিষ্ট ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক খুব মধুর ও একই সঙ্গে তিক্ততার। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি কিংবা উচ্চ-নীচ তফাই এই মধুর সম্পর্ক ভেঙে দেয়। ফাঁটল ধরায় পরম প্রেমের সম্পর্কের সুধা সৌধকেও। হিতাহিতজ্ঞান শূন্য করে তোলে ঐশ্বর্যের অহঙ্কার তদুপরি যুগে যুগে দাম্পত্যের প্রতির সম্পর্ক আমাদেরকে পরম শান্তি ও

তৃপ্তি দেয়। বেঁচে থাকবার রসদ যোগায়। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজ ও সাহিত্যে ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসভবের কবি’ নামক উপন্যাসটি তার প্রমাণ। ভারতীয় সমাজ গড়নে বিয়ের পর স্ত্রীরা স্বামীর বাড়িতেই কাটাবেন এটাই রেওয়াজ। স্বামী-স্ত্রী এক পরিবারে না থাকলে ভারতীয় সমাজ তা মেনে নেয় না। ভারতীয় সমাজে উভয় পরিবারই সমান দোষী। কোনো কারণেই হোক আর অজ্ঞাত কারণেই হোক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ফাটল ধরায় তার পরিবারেরই কোনো কোনো দুষ্টলোক। নষ্টামি যাদের রক্তে মজায়। আর দুই পরিবারের ঐশ্বর্যের ও বৎশগরিমার বহরও কিন্তু সমানভাবে দোষী; বলা যায় স্বামী-স্ত্রীর অহমিকা, পারস্পরিক অশ্রদ্ধাও আর একটি কারণ বলে মনে হয় এক্ষেত্রে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের উপাদান ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনচিত্রকে এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন—তা এককথায় জীবননিষ্ঠ ও জীবন ঘনিষ্ঠ।

আর একটি দিকের কথা আলোচনা না করলে শরদিন্দুর লেখাগুলির সম্পূর্ণতা ধরা পড়ে না। তা হ'ল হাসির উচ্ছ্঵াস। হাস্যরসের আবেদনে তাঁর উপন্যাস বলুন আর ছেটগল্প বলুন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক নির্দশন হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু ব্যক্তিগতভাবেও সদাহাস্যময় সুরসিক মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠুরতা, হতাশা, ক্ষোভ, জিঘাংসা তাঁর কাম্য নয়। প্রেমপূর্ণ রসপূর্ণ আনন্দময় জীবনই তাঁর কাম্য। কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, তুঙ্গভদ্রার তীরে এমনকি আলোচ্য উপন্যাসটিও তার উৎকৃষ্ট নির্দশন। তাঁর কথাসাহিত্যে হাসির উপাদান নিয়েও একটি স্বতন্ত্র গবেষণাও হতে পারে। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাগণ যদি একাজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন তাহলে আমরা অন্য এক শরদিন্দুকে পাবো। আলোচ্য উপন্যাস থেকে একটি উদাহরণ চয়ণ করে দেখাবো যে তাঁর লেখায় হাসির কি জোর। কি অনাবিল হাসি! এক ধাক্কায় যেন আমারা হাসির রাজ্যে পৌঁছে যাই। যেমন—রাজকুমারী ও কালিদাসের কথোপকথনে—

‘কালিদাসের মুখে আর কথা রহিল না। হৈমশ্বীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে উঠিয়া কবির  
বাম ক্ষঙ্কের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে! শিথার পরপারে দিগন্তের অস্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া  
আসিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিম্পন্দ হইয়া রাখিলেন; হৈমশ্বীও তাঁহার  
দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র শিথার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে।  
হৈমশ্বী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, নিরীহ ভাবে  
প্রশ্ন করিলেন—‘ও কী আর্যপুত্র?’

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি গভীর হইয়া বলিলেন—

‘ওর নাম উষ্ট !’

হৈমন্তী হাসি চাপিয়া বলিলেন—‘কী—কী নাম বললেন আর্যপুত্র ?’

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন—‘না না, উষ্ট নয়, উষ্ট  
নয়-উট্ট !’ উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্য করিয়া উঠিলেন।”<sup>১১</sup>

বসন্ত পূর্ণিমার এক তিথিতে স্বয়ংবর সভায় যে কাহিনি শুরু হয়েছিলো আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিষ্ঠা নদীর তীরে পর্ণকুটিরে তা শেষ হয়। বসন্ত পূর্ণিমা মিলনের তিনি। উজ্জ্বল জীবনের প্রতীক। হাসিও উজ্জ্বল। উভয়ে যেন পরম্পর ভাব-ব্যঞ্জনার দ্যোতক। যে অন্ধকার কালিদাস-হৈমন্তীর জীবনে করাল ছায়া ফেলেছিলো পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোকে যেন তা দীপ্তিময় হয়ে উঠলো পুনর্বার। এই পুনর্মিলন যেন চিরকালের—শ্঵াশত দীপ্তিময় মিলন। তাই অনাবিল হাসির ছোঁয়ায় দুঁটি বহু প্রতীক্ষিত জীবন কাছাকাছি এসে গেলো। আবার হাসি-ই মানুষের জীবন-দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। হাসি যেন মহৌষধি। তাই যে কারণে রাজকুমারীর সন্দেহ হয়েছিলো কালিদাস মূর্খ ঠিক সেই কথায় পুনরায় স্মৃতিপটে নিয়ে এসে পরম্পর কাছাকাছি এসেছে। অর্থাৎ কালিদাসেরই জয় হয়েছে। তাই সদা রসিক কালিদাস যেন শুধু কুস্তলরাজ কন্যা হৈমন্তীর হৃদয় জয় করেন নি; চিরকালের মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। আর এখানেই ‘কুমার সন্তবের কবি’ উপন্যাসটির চরম সার্থকতা। বলা যায়, হরের প্রেম যেমন কৈলাশ থেকে আমাদের আম বাগানে এসেছে তেমনি কালিদাসের প্রেম (রাজকুমারী হৈমন্তী) রাজপ্রসাদের সীমানা পেড়িয়ে নদীর তীরে পর্ণকুটিরে নেমে এসেছে।

সুতরাং সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, প্রেম কখনো ধনীর ধন ও মানীর মান দেখে হয় না। প্রেম হয় দুঁটি হৃদয়ের পরম্পর মিলনের সদিচ্ছার ওপর। সেখানে বিষয়-আশয় তুচ্ছ। কথায় বলে—যদি বা মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। অর্থাৎ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসটিতে এই দর্শন ভাবনারই পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন—যা শুধু এ কালের নয়—চিরকালের।

উপন্যাস মানুষের জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত অভিযোগ্যতাই প্রকাশ করে। মানুষের জীবনকে নিয়ে যেহেতু উপন্যাসের কারবার সেহেতু মানুষের অস্তঃচেতনার অনন্যসূলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের জীবন চলে মূলত দুঁটি খাতে। একটি সদর্থক খাত অন্যটি নির্বার্থক। বলা যায়, বিপ্রতীপতাই মানুষের ধর্ম। একই সঙ্গে একজন মানুষ শুভবুদ্ধি ও অশুভবুদ্ধি লালন করে; বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দোলাচলতায় জীবনকে সঠিক পথে চালাতে অসক্ষম হয়ে ওঠে। এমনকি পরিণতিতে মৃত্যুও ঘটে। ন্মেহে-অন্মেহে, প্রেম-প্রতারণায়, শ্রদ্ধা-

অশ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতা-কৃতয়তায় মানুষের জীবন প্রবাহিত হয়। উপরোক্ত প্রবৃত্তিগুলি মানবীয় হোক আর অমানবিক হোক—তা কিন্তু অনিত্য। শেষ নেই। সুন্দর প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত সমানতালে বয়ে চলেছে। তবে প্রাচীন মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিকযুগে মানুষ আরও বেশী প্রবৃত্তিগতি হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধের অভাব সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছে। আধুনিক প্রযুক্তির দিনে মানুষকে আরও বেশী বেশী করে প্রতারিত ও চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এক মিনিটে সারা বিশ্বে একসঙ্গে কত মানুষ যে প্রতারণা চক্রের শিকার হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই। মানুষের মন বিচ্ছি, মানুষের প্রবৃত্তিও বিচ্ছি। তবে আধুনিক যুগ বলুন আর উন্নত আধুনিক যুগ বলুন যত্ন ও চক্রান্তের ধরণটা কিন্তু পাণ্টে গেছে। সাধু সেজে অসাধু কাজ। হিংসা, লোভ, বর্বরতা, ক্ষমতা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় রক্তের সম্পর্কের কথা। এমনকি পরিবারের পিতা-মাতা, দাদা-ভাই প্রমুখ পরিবারিক সম্পর্কের কথা। হিংসা, লোভ, বর্বরতা ইত্যাদি যেখানে পরিবারে নেমে এসেছে সেখানে বহিরাগত কুটচক্র, যত্ন, ক্ষমতা বিস্তার, জিঘাংসা অবশ্যভাবীরাগে স্বীয় সান্নাজ্যে প্রবেশ করবে—সেটাই প্রত্যাশিত। বলতে দ্বিধা নেই যে, এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদানের সমন্বয়ে রচিত ইতিহাসান্তির উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে ইতিহাসের মানুষগুলিকে বর্তমানের পটভূমিকায় স্থিত করে তাদের জীবনের কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের মহিমময় কাহিনি, কত গণহত্যা-রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বান্দ্বিকতা, দ্বন্দ্বমথিত প্রেম, কৌতুক- কৌতুহল ও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ইতিবৃত্ত বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন।

ইতিহাসের উপাদান কীভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে, কীভাবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করবার পূর্বে আলোচনা করা জরুরি যে, কোন সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসটিতে সন্নিবেশিত করেছেন তার পর্যালোচনা করা। প্রসঙ্গত, এই অধ্যায়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘কালের মন্দির’, ‘গোড়মল্লার’, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ ও ‘কুমারসভ্বের কবি’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতেও ইতিহাসের উপাদান কী উপায়ে ব্যবহৃত পুনর্নির্মিত করা হয়েছে সে বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত ও পুঞ্জানুপুঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে। ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির আলোচনাতেও আমরা সেই ইতিহাসের ব্যবহার ও পুনর্নির্মাণের কাজটি কীভাবে লেখক করেছেন সেই দিকে নজর দেব। ইতিহাসের উপাদান ও ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

“এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Rebert Sewell -এর A Forgotten Em-

pire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাহলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell-এর গৃহস্থানি

৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডষ্টের রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনাকাল খু ১৪৩০-এর আশে পাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পোতুগীজদের ভারতে আগমণের (খু ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভাস্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইলতুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবরশাহ তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কঙ্কনা নয়। তবে বাবরশাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবিভৃত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানামত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন, অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রঞ্জু এবং ২ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।”<sup>৫৭</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রচিত উপন্যাসটিতে ইতিহাসের উপাদান ও চরিত্র থাকিলেও কাহিনীটি মৌলিক। বাস্তবিকই উপন্যাসটি পাঠে আমরাও তা অনুধাবন করেছি। শুধু তাই নয়, তাঁর রচিত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ইতিহাস এখানে কখনো কখনো নামমাত্র ব্যবহৃত হলেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ইতিহাস প্রসঙ্গ তুলে ধরিলেও ইতিহাস লেখেন নি; লিখেছেন উপন্যাস। উপন্যাসের আকারে প্রকরণে (Technique) যদি না লিখতেন তাহলে হয়তো এই বইগুলি খাঁটি ইতিহাসের অসামান্য প্রামাণিক দলিল হয়ে যেত। যেভাবে ইতিহাসকে তিনি ইতিহাসের সময়ে পুঞ্জানুপুঞ্জ বিশ্লেষণ ও যাচাই করে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর ঐতিহাসিক মননশীলতার ছাপ বর্তমান। বইগুলিও ইতিহাসের সংঘটনায় (Phenomenon) প্রোজ্জল। ইতিহাসের বাতাবরণ, স্থান-কাল-পাত্র, চরিত্র, সমাজ, রীতিনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃটনীতি, রাজদণ্ডনীতি সমস্তই যেন ঐতিহাসিক যুগের। দূর-দূরান্তের, অতীত স্মৃতির পূর্ণ স্বচ্ছ ছবি যেন ধরা পড়ে তাঁর রচিত ইতিহাসান্তিত লেখাগুলিতে। চকিতে অতীত যুগচিত্র হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। মোহ ধরায়, মায়াময় পরিবেশে নিয়ে যায়। এক নিম্নে যেন আমরা হাজির হই শত সহস্র সহস্র বছর পূর্বের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যন্তর ও অধিমানসিক মনভূমিতে। লেখক তাই ইতিহাসের মায়াকে ছাড়তে পারেননি। তবুও তিনি বার বার আমাদের স্মরণ করতে চান— ‘আমার কাহিনী Fictionised

history নয়, Historical fiction.”<sup>৪৮</sup> লেখকের এই পূর্বধারণার (Assumption) সূত্রে আমরা এই উপন্যাসটিকে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও প্রকরণ বিন্যাসের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করবো।

উপন্যাসের প্রথমপর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক ঐতিহাসিক সত্যতার কথা জানিয়েছেন—

“সঙ্গম বৎশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তাহাদের জীবন কথা অতি বিচিত্র। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঃলক দুই ভাতার অসামান্য

রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে

গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া

নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুক বেশিদিন মুসলমান রাখিলেন না।

তাহারা পলাইয়া আসিয়া শৃঙ্গের শক্র মঠের এক সন্ধ্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ধ্যাসীর

নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্নিষ্ঠিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া

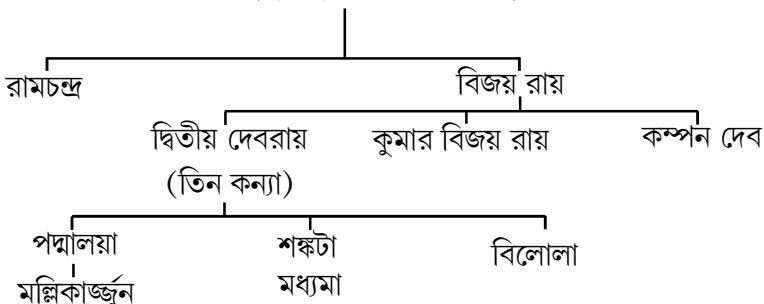
গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম

বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।”<sup>৪৯</sup>

কৃষণ নদীর দক্ষিণে যখন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় কৃষণ নদীর উত্তর দিকে শক্তিশালী একজন মুসলমান দিল্লীর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করেছিলেন। রাজ্যটির নাম হল ‘বহুমনী রাজ্য’। পরবর্তীকালে বিজয়নগর ও বহুমনী রাজ্যের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ-সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। বহুমনী রাজ্যের প্রবণতা হল কৃষণের দক্ষিণতীরস্থ ভূভাগে সাম্রাজ্য বিস্তার। আবার পক্ষান্তরে বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা হল কৃষণের দক্ষিণে যবন মুসলমানদের কোনো দিনও চুক্তে দেবে না।

যাইহোক, রাজ্য প্রতিষ্ঠার আনুমানিক একশতবর্ষ পরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যিনি রাজা হলেন তাঁর নাম দেবরায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইনিই প্রথম দেব রায় নামে পরিচিত। অসাধারণ রাজ্য শাসক, প্রসাশনিক দক্ষতা ও রণনৈপুণ্যে ছিল তাঁর। তাঁর রাজত্বকালের পঞ্চাশ বছরে মুসলমান প্রবেশ করতে পারে নি। উপন্যাসে প্রাপ্ত তাঁর বৎসরালিকা নিম্নে সরণীর সাহায্যে দেখানো হ'ল—

#### দেবরায় (ইতিহাসে প্রথম দেবরায়)



এছাড়াও অনেকনি দুর্গ, পারসিক দৃত, আহমেদ শাহ, বিদ্যারণ্য, সঙ্গম বৎশ প্রভৃতি ঐতিহাসিক অনুসঙ্গ। উপরোক্ত রাজ পরিবারকে নিয়েই কিন্তু শরদিল্লুর এই উপন্যাসের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আমরা এই সঙ্গম বৎশ সম্পর্কে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ— দিল্লীর সুলতানী যুগে বিশেষ করে মহম্মদ-বিন-তুঘ লকরে রাজত্বের শেষ দিকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। চরম নৈরাজ্য ও শাস্তিভঙ্গের কারণে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয় পূর্বভারতের বাংলাদেশে। ঠিক একই সময়ে বিজয়নগর ও বহুমনী নামে দু'টি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয় দক্ষিণ ভারতে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময়সীমা আনুমানিক তিন'শো বছরেরও বেশি।

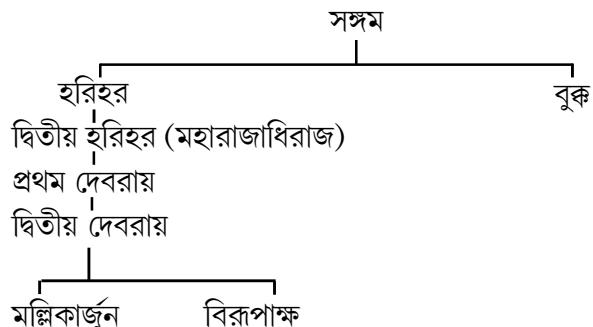
বিজয়নগর সম্পর্কে জানতে মূলতঃ তিন ধরণের উপাদানের ওপর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন—ক. ‘রাজকলা নির্ণয়’ ও ‘বিদ্যারণ্য কলাঞ্জান’, ‘মাদুরাবিজয়ম’ (গঙ্গাদেবী), ‘গঙ্গাদাস প্রলাপ বিলাসম’ (গঙ্গাধর রচিত নাটক)। খ. বিদেশী পর্যটক। যেমন—ইবন বতুতা (আফ্রিকা), নিকোলাকন্টি (ইতালীয়), আবদুর রজ্জাক (পারসিক), ডেমিনগোস পায়েজ (পতুগীজ) এবং ফেরিস্তা ও তাবাতাবা (মুসলমান) প্রমুখ। গ. প্রথম হরিহরের বাগেশ্বরী তাত্ত্বশাসন, দ্বিতীয় দেবরায়ের শ্রীরঙ্গমপট্টি, রাজা ইমাদী নরসিংহের দেবলক্ষ্মী পট্ট ইত্যাদি।

এছাড়াও Robert Sewell মনে করেন—১. এই সব কাহিনি ও জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে মোটামুটি বলা যায় যে, সঙ্গম নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। এই পাঁচ ভাতার মধ্যে হরিহর ও বুকই ছিলেন প্রধান। বলা হয় যে, মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মাধববিদ্যারণ্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর ভাই বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য তাঁদের একটি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।<sup>১০</sup> এছাড়াও আরও বহু প্রচলিত কিংবদন্তী পাওয়া যায়। ইতিহাস কোতৃহলী পাঠক পাঠিকাগণ ইতিহাসের পাতায় তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। কারণ আমাদের বিষয় ইতিহাস বর্ণনা করা নয় ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যাখ্যা করা। যাইহোক, এবারে আমরা সঙ্গম বৎশের বৎশতালিকা পরিচয় উল্লেখ করবার পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যে তিন শতাধিক সময় পর্বে যে চারটি (১৩৩৬-১৬২৭) রাজবৎশ রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তার পরিচয় তুলে ধরবো—

১. সঙ্গম বৎশ (১৩৩৬-১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দ)
২. সালুভ বৎশ (১৪৮৬-১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ)
৩. তুলুভ বৎশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ)
৪. আরবিড় বৎশ (১৫৭০-১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ)।<sup>১১</sup>

হরিহর ও বুক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের পিতা সঙ্গম এর নামানুসারে তাঁদের বংশের নাম হয় ‘সঙ্গম বংশ’।

### বংশতালিকা



লক্ষণীয় উপন্যাসিক বিজয়নগরে স্থিত দু'জন ভাষ্যকরের মধ্যে যেমন সায়নাচার্য কথা যেমন উল্লেখ করেননি ঠিক তেমনি আরো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে উপন্যাসে স্থান দেন নি। কিন্তু উপন্যাসিক ইতিহাসের ছবি বর্ণনা দেন নি। কিছুটা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে ইতিহাস উপন্যাস পাঠকের সামনে তুলে আনতে চেয়েছেন। সর্বোপরি ইতিহাসের উপাদান থাকা সত্ত্বেও লেখক আলোচ্য উপন্যাসটির কাহিনিকে মৌলিক বলে দাবী করেছেন। ইতিহাস প্রসঙ্গ অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তবুও লেখকের মনোগত কল্পনা ইতিহাসকে ছাপিয়ে গেছে। বলা যায়, ইতিহাস আর কবি কল্পনার পারম্পরিক সংমিশ্রণে একটি অপূর্ব ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। লক্ষণীয় ইতিহাস কাহিনির প্রসারক আর কল্পিত কাহিনি উপন্যাসের সম্পূরক। স্পষ্টত, ইতিহাসের নিরিখে বিজয়নগরস্থিত মানুষগুলির সামগ্রিক জীবনের অনুপুঙ্গ জীবনচর্চা ও চর্যার বৈচিত্র্যময় ছবি অঙ্কিত হয়েছে। ‘তুঙ্গ ভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটির অন্তর্বর্যণে অন্ততঃ আমাদের চোখে তাহ-ই ধরা পড়ে।

‘জীবন এত জটিল কেন?’<sup>৬২</sup> আলোচ্য উপন্যাসটির মূল সুর হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে উল্লিখিত প্রশ্নটির যথাযথ উত্তরে। এককথায় এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসটিতে অঙ্কিত কাহিনি, চরিত্র ও ঘটনাবলীর মনোজগতের অন্তস্থলে তুকে উদ্ধৃত প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করা যেতে পারে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও একবার দার্শনিক উপলব্ধিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ‘কবি’ উপন্যাসে প্রশ্ন তুলেছিলেন—‘হায়! জীবন এত ছোট কেনে?’<sup>৬৩</sup> যদিও দু'টি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা তবু যেন কোথাও একটা গভীর সাযুজ্য চোখে পড়ে। নিতাই কবিয়াল জগৎ-জীবনের কঠিন বাস্তব রূপ দেখে, সম্পর্কের পূর্ণতা-অপূর্ণতা দেখে ও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে গেয়ে ওঠে—

“এই খেদ আমার মনে—

ভালোবেসে ছিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে

হায়! জীবন এত ছোট কেনে—?

এ ভুবনে ?”

জীবন জটিল জালে আবর্ত হতে হতে একদিন ছোট হয়ে আসে। ফুরায় জীবনের সব লেন দেন। মহাকাল টেনে নিয়ে যায় দিগন্তের সীমা পেড়িয়ে। থাকে শুধু স্মৃতি। যে জীবনে স্মৃতি নেই সে জীবন অচল অসার। তাই কবিয়াল যে জীবন চক্রে আবর্তিত হতে হতে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে জীবনকে ভালো ভাবে চিনতে শিখেছে, জানতে শিখেছে ঠিক তেমনি আলোচ্য উপন্যাসের কলিঙ্গ রাজকুমারী মহারাজ ভানুদেবের সুশ্রী কন্যা ভেবেছে—‘জীবন এত জটিল কেন?’ কারণ উর্মিমুখর জীবন ঘূরপাক খেতে খেতে জটিল আবর্তে চক্রাকারে ঘূরতে ঘূরতে কোথায় যে গিয়ে পড়বে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। কোথায় যে এর শেষ। কারণ, মানুষ চায় এক হয় আর! সমস্তই যেন অদ্বিতীয় অদৃশ্য খেলা। স্বাভাবিকভাবে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে ‘জীবন এত জটিল কেন?’। আমরা আরো একটু বিস্তারিত ভাবে উপন্যাসটির কাহিনি তুলে ধরতে চাই যে, উপন্যাসটি মূলত শুরু হয়েছে হিন্দু রাজ্য ও মুসলমান রাজ্যের পরম্পর বৈরিতা, দৰ্শন, ঘড়্যন্ত্র, কপটতা সাম্রাজ্য বিস্তার, গুপ্তহত্যা, পররাষ্ট্র দখল এমনকি কালেভদ্রে স্বজাতীয় রাজাদের সিংহাসন দখল, আক্রমণ অন্তৈক কার্যাবলীর বিবরণ দিয়ে। লক্ষণীয়, বিজয়নগরের মহারাজা দেবরায় রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিবেশী সমস্ত হিন্দু রাজাদের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য দৃত পাঠায়। সম্মতি দিলে ভালো নচেৎ যুদ্ধ অবশ্যভাবী। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব কিন্তু বিয়েতে রাজি হয়নি। তাই তার বিরঞ্জকে দেবরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ভানুদেব কন্যাকে দেবরায়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করে। পূর্বশর্তমত দেবরায় কিন্তু কলিঙ্গ রাজ্য গিয়ে বিয়ে করতে পারবেন না ভানুদেবকেই তার কন্যাকে বিজয়নগরে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। সেই মোতাবেক মহারাজ রাজকুমারী বিদ্যুম্বালা ও মণিকঙ্কণাকে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে নৌযাত্রায় পাঠাবেন। সমস্ত ব্যবস্থা করে মাতুল চিপিটকমূর্তিকে অভিভাবক করে আরও কয়েকজনসহ দাস-দাসী যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। তারা রহনাও দেয়। বহুদিনের পথ। তিনটি নৌযান নিয়ে কৃষণের বক্ষে চেপে তারা চলেছে বিজয়নগরের দিকে। জলপথে অনেক হাস্য পরিহাস, বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে গান বাজনা, মন্ত্রণা, খাওয়া-দাওয়ায় তাদের দিন কাটে। এমন সময় মাঝ নদীতে একজন মানুষকে ভেসে আসতে দেখে। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখে। শেষে বলরাম কর্মকার জলে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। আমরা বলরামের পরিচয় পরে দেবো। নিমজ্জিত

মানুষটিকে সুস্থ করে তোলার পর নৌকায় নিয়ে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে চায়। জলে নিমজ্জিত মানুষটি পরিচয় দেয় যে, তার নাম অর্জুন বর্মা। এদিকে চারিদিকে গুপ্তচরের ভয়। রাজকুমারি দ্বয়ের মামা চিপিটক মূর্তি অর্জুনকে ডেকে পাঠিয়েছে অন্য নৌকায়। সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি ম্লেচ্ছ? মুসলমান? অর্জুন গন্তীর স্বরে বলে না আমি ক্ষত্রিয় হিন্দু। সেকালে গা শুঁকে দেখবার রীতি ছিলো। তার গা শুঁকে দেখা হয় রসুন পেঁয়াজের গন্ধ যে, তার নেই সব জলে ধুয়ে গেছে। এবার তাকে প্রশ্ন করে অর্জুন কে ছিলো? সে বলে, পাণব। পাণবের বাবার নাম কিভাবে এল? উত্তর এল দেবরাজ ইন্দ্র, সে কিন্তু ভেবেছিলো পাণু। যাইহোক, তার দিক মনোমত উত্তর না হওয়াতে তাকে বেঁধে রাখতে বলায় বলরাম এসে বলে সে তো ঠিকই বলেছে। বেঁধে রাখতে হলে তোমাকেই বেঁধে রাখা উচিত। সেদিন থেকে অর্জুনের আর কোনো সমস্যা নেই। বলরামের সঙ্গে নানান কথা বলে। বলরাম পরিচয় দেয়, সে বর্ধমানের বাঙালি। সেখানে মুসলমানদের অত্যাচারে পালিয়ে এসেছে। এমনকি তার বউটাকেও ম্লেচ্ছরা ধরে নিয়ে গেছে বলে তার দুঃখ। তাই কোথায় হিন্দু রাজা রয়েছে তার আশ্রয় পেতে কলিঙ্গ দরবারে এসেছিলো। নৌকায় জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীও তারা শোনে এবং গানও ধরে। বিদ্যুম্বালা ও মণিকক্ষণা উভয়েই হাস্যমন্ত্রী থাকে। মণিকক্ষণা চত্বলা। কোনো কিছুতেই সে খারাপ পায় না। অন্য দিকে বিদ্যুম্বালা গন্তীর প্রকৃতির। সে ভাবে চিন্তা করে। মাঝে মাঝে মন্দোদরীর সঙ্গে হাসিঠাটায় মন দেয় আবার পরক্ষণে নানান চিন্তা করে। ভাবে মেয়েরা কখনোই তো বরের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে না। এ কেমন রীতি। মেয়েরা কি পুরুষের সম্পত্তি? এ কেমন রাজনৈতিক খেলা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। ‘ঘরের মেয়েরা কি এর জন্য দায়ী? মণিকক্ষণার কিন্তু এসবেতে মন নেই। সে ভাবে রাজার তিনটি বউ রয়েছে। তারা কেমন! রাজা কেমন। বিদ্যুম্বালা বলে তুই চতুর্থী হবে। মণিকক্ষণা ভাবে যদি আমাকে রাজা তাঁর চরণতলে একটু স্থানও দেন তবুও আমি থাকবো। বিদ্যুম্বালা ভাবে জীবন কেন এত জটিল? পাকে পাকে গ্রহ্ণি! এই গ্রহ্ণি কবে খুলবে? ওদিকে রাজা দেব রায়ও পঁয়াগ্রিশ বছরের সুদর্শন পুরুষ, তেজ বীরত্ব প্রসাশনিক দক্ষতা সবেতেই দক্ষ নিপুণ। তাঁর পিতা দুই ভাই তিন রাণী ও পুত্র মল্লিকার্জুন রয়েছে। কুমারিদের আসবাব খবর পেয়ে ভাই কুমার কম্পনদেবকে পাঠিয়েছেন অতিথিদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসতে। মহারাজের আদেশ মতো সে ঘাটে যায়। প্রথমেই দেখতে পায় অপূর্ব রমণীয় কাস্তি উচ্চল যৌবনা মণিকক্ষণাকে তারপরে তার চোখে পড়ে আরো স্নিফ্ফ, অপূর্বমাধুর্য, পেলবকমণীয় সুন্দর যৌবনে ভরপুর বিদ্যুম্বালার ওপর। দেখে তার লোভ হয়। সে কপট ধূর্ত, লোভী কামাসক্ত। এর পরিচয় শেষে আমরা উদ্ঘাটন করবো। যখন কুমারিদ্বয় ও অন্যান্য যাত্রীরা সকলে ঘাটের কাছে আসবে ঠিক ঐ সময় সহসা প্রবলবেগে ঝড়

বয়ে গেল, বিরাট প্রকাণ্ড ঝড়! মনে হয় যেন এখনকার ভাষায় হ্যারিকেন বা টর্নেডো! সব লঙ্ঘ ভঙ্গ হয়ে গেল। মুহূর্তে মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। জলোচ্ছাস! ধূলো ইত্যাদি। নদীর জলে চিপিটক মূর্তি ও মন্দোদরী ভেসে যেতে লাগলো। চিপিটক মূর্তি মন্দোদরীর পা জড়িয়ে ধরে জলের তলে জল খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। মন্দোদরী ওড্রদেশের হস্তীর মতো মোটা মেয়ে মানুষ। সে কিন্তু ডুবল না। শেষে তারা দু'জনে একে বারে সকলের নজরের বাইরেই চলে গেল। তারা আর ফিরে এল না নৌকায়। অন্যকূলে ভেসে গেল—একটা তীরে পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা তুলে এনে তাদের ধরে নিয়ে গেল। সম্পর্কে মামা ভাগ্নে। যেহেতু রাজ মাতুল। কিন্তু গ্রামের লোকের ভয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে জীবন কাটাতে হলো। মন্দোদরীও বেশ মজাই পেয়েছিলো। চিপিটক মূর্তির ভাগিনীদের কথা মনে হলেও মন্দোদরী প্রেমে স্ত্রী সুখে তাকে ভুলিয়ে রাখতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত লেখকের কথায় মন্দোদরীর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিপিটক মূর্তির এই নিদারণ দশার কারণ হ'ল—মন্দোদরীর গৃহে না ফেরার মতলবে তাকে সেখানেই থাকতে হলো সারাটা জীবন। হায়! রে চিপিটক মূর্তি। নারীর মনের কথা কে বোঝে? নৌকা ফিরে যাচ্ছে দেখেও তোকে খবর দেয় নি পাছে তুই চলে যাস। দেশের বাড়ি ফিরে গেলে যে তোকে স্বামী হিশেবে পাবে না এটা বুবিস না। এভাবেই নারী মনস্তদ্বের দিকটির প্রতিও লেখকের নজর এড়ায় নি।

যাইহোক, এবার ফিরে আসা যাক, কুমারি বিদ্যুমালার কথায়। বিদ্যুমালাও ঝড়ের মধ্যে পড়ে নীদর জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় কোনো রকমে দেখতে পেয়ে অর্জুন বর্মা নদীর জলে ঝাঁপ দেয় কুমারিকে বাঁচাতে। শেষে দু'জনে ভাসতে ভাসতে নদীর মধ্যে একটি দীপে গিয়ে ওঠে। কুমারি হতঙ্গান, বাক্রান্দি। শুধু ভাবছে কেউ একজন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আলুথালু বেশ। পরনে শাড়ি আলগা, চুল আলুলায়িত, মুখ বিবর্ণ অর্থাৎ তার কোনো হঁশ নেই। অর্জুনবর্মা তাকে মধ্যরাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখে। গভীর রাতে কুমারির ক্লাস্তি দূর হলে জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে ওখানে কেন তা জানতে চায়। অর্জুন সমস্ত বৃত্তান্তই বলে। শেষে কুমারি বলে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো! আর সকলে কোথায় জানতে চায়। নৌকাগুলি কি জলে ডুবে গেছে? অর্জুন বলে সকলে ঠিক আছে, নৌকাও ডুবে নি। যাইহোক, দু'জনে নির্জনে নিভৃতে নিশ্চৰ্থী রাতে দু'জনের ব্যবধান স্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ার কথা। কুমারি এবার চোখ খুলে আকাশের পানে চায়। কত তারা। জিজেস করে রাত কত বাকি। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর বলে আচ্ছা এবার তোমার পরিচয় দাও। অর্জুন ইতস্তত করে নিজের পরিচয় দেয় পিতার নাম রাম বর্মা। তারা যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়। তার পূর্বপুরুষ বহু শতাব্দী আগে উত্তরদেশ থেকে এসে

কৃষ্ণ নদীর তীরে বসবাস করতে শুরু করে। উত্তরদেশে যবনের আবির্ভাবে মানুষের দৃঢ়খের অবসানের কথাও জানায় সে। দান্তিগাত্যেও যবনের অত্যাচারে তারা বিধ্বস্ত হয়েছে। আমরা এই কাহিনি আগেও উল্লেখ করেছি। তাই সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল। অর্থাৎ মুসলমান শাসকের অত্যাচারে তারা কিন্তু ভীত ছিলো সর্বদাই। তারা যে বহুমনী রাজ্যের রাজধানী গুলবর্গায় থাকে সেখানেও যবনদের, স্লেছ মুসলমানদের ভয়ে অনেক হিন্দু মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। অনেককে তারা ধরে ধরে গো-মাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়েছে। ধর্মান্তর করেছে শাসনে ও পীড়নে। স্লেছ মুসলমানরা খুব চতুর। প্রতিভা সম্পন্ন দক্ষ হিন্দুদের ধরে ধরে গো মাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়ে তাদের সুবিধার্থে কাজে লাগায়। একদিন তাদের কাছেও খবর এলো তাদের গো-মাংস খাইয়ে মুসলমান বানাবে। তার বাবা বয়স্ক হওয়ায় তাকে বলে বাবা তুই হিন্দু রাজ্যে চলে যা না হলে রক্ষে নেই। অর্জুন কিন্তু আসতে চায় নি। শেষে বারংবার পীড়াপীড়িতে সে বাড়ি থেকে পালায়। ঠিক ঐ সময় স্লেছরা আসে। সে দৌড়ে গিয়ে কৃষ্ণার জলে ঝাপিয়ে পড়ে। স্লেছ তার পেছনে পেছনে দৌড়ালেও তাকে আর দেখতে পায় নি। কিন্তু তার পিতার যে কি হলো তা আর সেই মুহূর্তে সে জানতে পায়নি। পরে যদিও সে জানতে পায় তার বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গেছে। পরে অনশনে তার বাবা মারা যায়। কথাগুলো শুনে রাজকুমারির হাদয় কিন্তু বাঞ্পাছন্ন হয়ে ওঠে। কিছুটা হলেও অনুরাগের সুর কুমারির হাদয়ে বেজে উঠেছিলো সেদিন। অর্জুনের স্পর্শের কথা সে ভাবে। আর ভাবে মহারাজ দেবরায়ের কথা। মণিকঙ্কণার সঙ্গে দেবরায় প্রসঙ্গে তার দ্বিতীয়েই কথা ধরা পড়ে। কেননা দেবরায় তিন জন রাণীর স্বামী। কেউ ভাগ দেয় চায় না। দিতেও পারে না। কোনো কোনো নারী আবার স্বামীকে ভাগ বাঁটোয়ারার পক্ষে অত্যন্ত কঠোর। বিদ্যুমালাও তাদের দলে। হোক না রাজা মহারাজা। এতগুলো রাণী! সে মেনে নিতে পারে না। বলে শ্রীরামচন্দ্র ও তো রাজা ছিলেন। তাঁর তো শুধু সীতা ছাড়া কেউ নেই। মণি বলে তোর ব্রেতাযুগের কথা। এখনকি তা বললে হয়। মণিকঙ্কণা চঞ্চলা এগুলোতে তার নজর নেই। মহারাজাকে সে পাবে না জানে কিন্তু মনে আশাও রয়েছে। শেষে যদিও তারই ভাগ্যে মহারাজ জোটে। তবে শরীর বদলায় না নাম বদলায়। নাম বদল করে তার মহারাজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ছিলো মণিকঙ্কণা হয়ে গেলো বিদ্যুমালা। ছিলো বিদ্যুমালা হল মণিকঙ্কণ। হায়! রে নিয়তি। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের ভাগ্যে নিয়তি কোনো না কোনো ভাবে ভর করে। পাণ্টে দেয় তাদের জীবনে চলার পথ ও মত। এভাবেই মানুষকে চলতে হয় এমনকি চলতে বাধ্যও হতে হয়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় চরিত্রদের ভাগ্যে নির্মম নিয়তির অমোঘ বাণ নেমে এসেছে এখানেও যেন তাই-ই হ'ল।

যাইহোক, সকালে কম্পনদেব ঘাটে ফিরে এসে দূরে দু'জন মানুষকে তীরে পড়ে থাকতে দেখে। ক'জন রক্ষীকে নিয়ে গিয়ে দেখে কুমারির পাশে একজন ঘুবক পড়ে রয়েছে ঘুমস্ত অবস্থায়। কম্পনদেবের ডাকে সে জাগে। অর্জুন বর্মা ঘুমের ঘোরে নাম শুনতে পেয়ে জাগে। তখন সকলে রাজপ্রাসাদের দিকে চললো। সঙ্গে নেই শুধু চিপিটক মূর্তি ও মন্দোদরী। তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো সকলে। যাইহোক পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, কম্পনদেব কামার্ত লোভী পরুষ। একদিকে নারী অন্যদিকে সাম্রাজ্য। মুখে হাসি অন্তরে কটু। ছলে বলে সে এই দু'জন কুমারকে পেতে চায়। তাই ফন্দি করে। মহারাজ দেবরায়কে বলে অর্জুনবর্মার সঙ্গে বিদ্যুম্বালা রাত কাটিয়েছে। তার স্পর্শ লেগেছে। এ মেয়েকে বিয়ে না করাই শ্রেয়। যাইহোক, কন্যেযাত্রীদের থাকবার খাওয়ার সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা নিয়ে হয়ে গেলো। রাতে মহারাজ দেবরায় মন্ত্রি ধন্বায়ক লক্ষ্মণ মল্লপকে ডাকলেন। মন্ত্রণা করলেন। শেষে রাজগুরু কূর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হলো। তিনি এলেন। স্পর্শদোষ। বিবাহযোগ্যা কন্যার পরপুরুষের স্পর্শদোষ। তাই তাকে তিন মাস ব্রত করতে হবে। পম্পপতির মন্দির প্রত্যহ উষায় পুজো দিতে হবে। আমরা আর একটা কথা এখানে একটু বলি, অর্জুন যখন ভাসতে আসছিলো তার হাতে দু'টো বাঁশের লাঠি ছিলো। লাঠি দুটো তার অন্ত স্বরূপ। এই অস্ত্রে ভর করে সে ছুট্টে ঘোড়ার থেকেও বেশী ছোটে। যাইহোক, কুমারির একটু স্বাদ হলো। এবার অর্জুনকে ডেকে পাঠানো হ'লো অর্জুন লাঠি হাতে এসে উপস্থিত। কিন্তু মহারাজার ঘরে কোনো রকম লাঠি অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিয়েধ। মহারাজা এবং মহামন্ত্রি দু'জনেই অর্জুন বর্মার পরিচয় নিলেন। দু'জনেই প্রশ়া করলেন। অর্জুন সমস্ত বৃত্তান্ত বললে। মহারাজা কিন্তু খুশিই হলেন। যাইহোক, অর্জুনকে অতিথি শালায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু তার পিছনে রাজার গুপ্তচর লাগানো হ'ল। সেটাই রাজকীয় নিয়ম। এদিকে রাজঅস্তঃপুরে রাজার বিলাস ব্যসন, খাওয়া দাওয়া রাণীদের সেবা ইত্যাদি দাসী পিঙ্গলার যত্নে সবই স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকলো। নৃত্যগীত, খাদ্যবস্তু, ভোজন প্রণালী, বিভিন্ন রঞ্জন প্রণালী, রাণীদের সঙ্গে মণিকক্ষণার পরিচয়। ছোটো রাণীর পুতুল পুতুল খেলা, রাজকার্য চলা, কম্পনদেবের গৃহ নির্মাণ, পররাষ্ট্র থেকে গুপ্তচর, এরাজ্যের গুপ্তচর পররাজ্যের খবর আদান-প্রদান, পারসিক রাজদুতের আগমণ স্বাভাবিক চললো। বিদ্যুম্বালার ব্রতও শুরু হয়ে গেছে। মণিকক্ষণা ঘন ঘন মহারাজের কাছে থাকে। সুপারি পান সাজিয়ে দেয়। দাসী পিঙ্গলার সঙ্গে কাজ ভাগ করে নেয়। কিন্তু একজনের মনের খবর কেউ নেয় না। সে হ'ল বিদ্যুম্বালা। ব্রত উপলক্ষে অর্জুন বর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অর্জুনের খবর নেওয়া ইত্যাদি অর্জুন বর্মার প্রতি তার আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ে বৈ করে না। এই সময় রাজা অর্জুন বর্মাকে গুপ্ত কাজে ভাই কুমার বিজয় রায়ের নিকট পাঠায়। কুমার বিজয় রায় শক্র মোকাবিলা করতে গেছে। আসলে

পিতা, পিতামহের নাম ঘুরে ফিরেই আসে কোনো কোনো রাজবংশে এটাই রাজকীয় নিয়ম। যাইহোক, এই সময়ে মহারাজা সীমান্ত দর্শনে যাবেন। বেরিয়েও গেলেন দলবল মন্ত্রি সহ। দিন যায় দিন আসে। কুমারি কিন্তু অর্জুনের সাক্ষাৎ পায় না। তবে মহারাজ অর্জুন বর্মা ও বলরামকে ভৃত্য বানিয়ে তাদের রাজবাড়িতে স্থান দিয়েছেন। অর্জুন গুণী, বলরামও গুণী। রাজা গুণী জনের কদর জানেন। অর্জুনের গুণ বৎশ দণ্ডে ঘোড় দৌড় অপেক্ষাও বেশি ছোটে, যুদ্ধ জানে, বীর ক্ষত্রিয়। আর বলরাম গুপ্তবিদ্যা জানে। কামান বানানো। মহারাজা এটা নৃতন কি। বলরাম বলে মহারাজ এমন কামান বানাই যাতে একটি কামান একজন যোদ্ধা চালাতে পারে। মহারাজা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেন—তাই নাকি। তুমি বানাতে পারবে। পরীক্ষা করে দেখাও। দেখানোও হ'ল। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের নিভৃতে গুহায় (সক্ষেত্র গুহা) যেখানে দাসদাসীদের প্রমত্তের স্থান সেখানে জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলেন। চলতে থাকলো কামান বানানো। আসলে উপন্যাসিক এখানে বোঝাতে চাইছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিলো। অনেকেই তা ব্যবহার করেছেন। এর আগেও ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসে অগ্নিকন্দুকের ব্যবহার করে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওই সময়ের মহারাজারা বোমার ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ প্রগতিশীল ভারতবর্ষের কথা তুলে ধরতে চাইছেন। মহারাজা বহুদিন হ'ল সীমান্তে গিয়ে সৈন্যদের চাঞ্চা করে তুলছেন। শক্ররা ওত পেতে বসে রয়েছে। সচেতন থাকতে হবে। ম্লেচ্ছরা বড় চালাক। তারা যেকোনো প্রকারে সাম্রাজ্য দখল করতে চায়। তাই সদা সতর্ক থাকতে হবে।

কিন্তু রাজান্তঃপুরে কি কি ঘটছে তা কেউ জানতেও পারলো না। যদিবামাত্র পিঙ্গলা দু'একবার ঠাহর করেছিলো, আমল দেয় নি। বিদ্যুম্বালা ও অর্জুন বর্মার প্রেম আর বলরাম ও মঞ্জিরার প্রেম। বলরাম-মঞ্জিরার প্রেম প্রসঙ্গিকভাবে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। এখন বিদ্যুম্বালার প্রেম ও অর্জুনের প্রেম পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদিও দুটি প্রেমের কাহিনি পরম্পর সমান্তরাল ভাবে বর্ণিত হয়েছে। একটি মুখ্য অন্যটি গৌণ। তবুও একটি অন্যটির পরিপূরক। বলরামের প্রেমোন্মাদনা কিন্তু অর্জুনের প্রভুভুক্ত মনকে টলিয়েছে। মঞ্জিরার সঙ্গে বলরামের স্থিতা, পরম্পর সামিধ্য, মঞ্জিরার বাঁশি বাজানো সমস্তই লেখক কিন্তু অর্জুন বর্মার প্রেমের স্ফূর্টন ঘটাতে পরম্পর এই কাহিনিটির অবতারণা করেছেন। অর্জুন বর্মা বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ কৃতজ্ঞ এমনকি কুমার কম্পনদেবের হাত থেকে মহারাজকে বাঁচিয়েছে। মহারাজ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। অর্জুন বর্মাকে পুরক্ষার স্বরূপ তাঁর সারাক্ষণের দৈহিক রক্ষী বানিয়েছে। অর্থাৎ অর্জুন বর্মা ও মহারাজ দেবরায় পরম্পর পরম্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। রাজমহলে অর্জুনের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্জুন বিজয়নগর রক্ষার্থে, ম্লেচ্ছদের তাড়াতে কিংবা ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও

কোনোদিন পিছপা হবে না বলে সগর্বে জানায়।

যাইহোক, কুমার কম্পাদেবের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য ভাবে এসে যায়। কুমার কম্পনদেবকে মহারাজা দেবরায় অত্যধিক স্নেহ ও বিশ্বাস করতো। রাজদরবারের গোপনীয়, অতিগোপনীয়, রাজমন্ত্রণা, রাজস্ব আদায়, প্রজাপালন প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই তার স্থান ছিল। ভাতৃস্নেহে মহারাজা অঙ্গ ছিলেন। কিন্তু পিতা বিজয় রায় ও মন্ত্রি ধন্নায়ক লক্ষণ মল্লপ বারষ্বার কম্পনের গোপন অভিসন্ধির কথা জানিয়ে সচেতন করেছিলো মহারাজকে। এমনকি কম্পনের কুটচাল, ঘড়যন্ত্র, রাজক্ষমতা লোভ, সিংহাসন লোভ, নারী লোলুপতা, মহারাজের মর্যাদাহনী এমনকি মহারাজের প্রাণনাশ সমস্তই জানাতেন। কিন্তু মহারাজ জানেন কুমার কম্পন তাঁর ছোট ভাই; কোনো দিনও তাঁর ক্ষতি সে করতে পারবে না। কিন্তু মানুষের মন কত বিচ্ছিন্ন খাতে চলে কে জানে? মহারাজও কিন্তু তা কুমার কম্পনের অস্তরের লোভ ও জিঘাংসার কথা ধরতে পারেন। কম্পনদেব ভেতরে ভেতরে এক ফণি বের করলো। রাজমহলের কাছাকাছি আর একটি মহল তৈরি করবে। মহারাজ দেবরায় কিন্তু তাতে বাঁধা দেন নি। রাজমহল তৈরিও হ'ল। এবার গৃহে প্রবেশের পালা। কম্পনের উদ্দেশ্য গৃহ প্রবেশে পিতা, মহারাজা ও মহামন্ত্রীসহ বাছা বাছা দশ বারোজনকে ডেকে প্রাসাদের অভ্যন্তরেই তাঁদের গুপ্তভাবে হত্যা করে রাজ্যের অধীশ্বর হবে। গৃহে প্রবেশের একদিন আগে রাত্রে মহারাজ ও মহামন্ত্রি দু'জনের মধ্যে মন্ত্রণা হয় যে, কুমার কম্পন কেন বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করলেন। কোনো দূরভিসন্ধি নিশ্চয় তার রয়েছে। কথা মিথ্যা নয়। একে একে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের মধ্যে দু'জন তিনজনকে তার গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠানে গুপ্ত ভাবে হত্যা করেছে। চলছে জোর কদমে হত্যালীলা। রক্তপিপাপু জিঘাংসু কম্পনদেব শুধু অপেক্ষা করছিলো দেবরায়, মন্ত্রি আসছেন না কেন? তবে কি তারা আসবেন না। না আসলে স্বয়ং রাজপুরীতে গিয়ে তাঁদের গুপ্ত হত্যা করবে—সংকল্প নেয়। তবে রাজপুরীতে যাওয়ার আগে বৃদ্ধ পিতাটিকে হত্যা করা চাই। পিতা রাজপুরীর নিকটস্থ থাকেন। পিতার নিকটে উপস্থিত হলে পিতা বলে কি চাও? কম্পনদেব মোজার ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু না বলে পিতার বুকে ছুড়ি মারে। পিতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সময় বলে তোর সর্বনাশ হবে। আর কিছু মুখে কথা আসেনি, তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শেষে রাজপ্রাসাদে ঢুকে মহারাজ দেবরায়কে হত্যা করবার জন্য ইতঃস্তত করে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। এদিকে অর্জুনবর্মা বিনা কারণে রাজপ্রাসাদে ঘোরাফেরা করছিলো। কুমার কম্পনদেবের কাটিতে ছুরি। তার মানসিকগতি সন্দেহমূলক হওয়ায় সে-ও কম্পনের পেছনে পেছনে মহারাজের ঘরে যায়। সেখানে এক অঙ্গুদ দৃশ্য দেখিলো। কুমার কম্পন বড় ভাই মহারাজ দেবরায়ের বুকে ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হলে মহারাজ প্রতিরোধ করলে মহারাজের হাতে লাগে এবং

অরোরে রক্তপাত হতে থাকে। কম্পনদেব আবার মহারাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে ছুরি তুলতেই অর্জুনবর্মা তার সর্বসময়ের সঙ্গী লাঠির অগ্রে যে বল্লম ছিলো তা দিয়ে গলায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে এবং মহারাজ দেবরায়কে বাঁচায়। আসলে লেখক এখানে দু'টি বিষয় দেখাতে চেয়েছেন। এক. লোভ লালসা, জিঘাংসা বৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ আপন জনকেই কীভাবে হত্যা ও আঘাত করে তার চূড়ান্ত উদাহরণ। কম্পনদেবের যে লালসা রাজ্য ছাই। এত ভালোবাসা, অফুরন্ত মেহ, সর্বোপরি রক্তের সম্পর্ক কোথাও কম্পনকে অনুশোচিত করে নি। পিতা যিনি জন্মদাতা তাকেও হত্যা করতে তার বাঁধেনি। সাম্রাজ্যের মোহে মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে, কতটা মনুষ্যত্বহীন হতে পারে, কতটা নির্ভুল হতে পারে সেই দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। দুই. প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটতো। সেকালে প্রাণের মূল্য ও সম্পর্কের বাঁধনের কোনো মূল্য ছিলো না। অতিতুচ্ছ কারণে মানুষকে হত্যা করা কিংবা এক রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে বিরল ঘটনা নয়। হয়তো ঔপন্যাসিক এই হত্যা দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক সত্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শরদিন্দুর ইতিহাসান্তিত দু'টি ছোটগল্পে তার পরিচয় মেলে। প্রথমটি, ‘বিষকন্যা’ এবং দ্বিতীয়টি ‘তত্ত্ব মোবারক’। ‘বিষকন্যা’ গল্পে ব্যবহৃত ইতিহাস এখানে উল্লেখযোগ্য—

“শিশুনাগ বৎশের ইতিবৃত্ত পুরাণে আদ্যস্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে নাই,

অজাতশক্তির পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিত

বিক্রম অজাতশক্তির পর হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্যন্ত মগধে এক প্রকার

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল। পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগ রাজবৎশের

একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য

হানাহানি অন্তর্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসন্দৰ্ভ হইয়া হইয়া পড়িয়াছিল।”<sup>৬৪</sup>

মহারাজকে হত্যার চেষ্টা করবার কথা রাজপ্রাসাদে রাষ্ট্র হতে না হতেই হৈ হল্লোড় পড়ে গেল। রাণীদের তো বাইরে বেরোনো নিয়ে যতক্ষণ না মহারাজার আদেশ পায়। কিন্তু অন্তরে তাদের শ্যেল বিঁধে গেল মনে হয়। একি হ'ল। একে একে পিঙ্গলা, লক্ষণ মল্লপ ও মণিকক্ষণা সকলে রাজার ঘরে ছুটে এলো। মহারাজ বিস্ময় ভরা মনে বললেন—‘কম্পন আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, অর্জুন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার আঘাত মারাত্মক নয়, তবে ছুরিকায় যদি বিষ থাকে—।’<sup>৬৫</sup> দেবরায় করণ ভাবে মন্ত্রিদিকে তাকিয়ে বললেন—‘তোমার সন্দেহই সত্য’।<sup>৬৬</sup> এই একটি মাত্র বাকেয়েই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভাই কম্পনদেবকে বিশ্বাস করে তাঁর কতটা ভুল হয়েছিলো। মানুষকে বিশ্বাস করাটা কি অন্যায়? ভালোবাসা, মেহ করা বুঝি

অপরাধ! ভাবতে ভাবতে দেবরায়ের অন্তর বিসাদে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

যাইহোক, অর্জুন বর্মা রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাকে মহারাজ সাবাস দিলেন। এবং সমস্ত বৃক্ষান্ত শুনলেন। ওদিকে মেজো ভাই কুমার বিজয় রায়কে সংবাদ দিতে হবে নচেৎ তাকে কেউ ভুল বোঝাবে। তাই অর্জুনকে সেখানে পাঠালেন এবং বললেন ফিরে এসে সে যেন রাজার প্রাণরক্ষার ভার নেয় প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

দেবরায়ের চিকিৎসা চলতে লাগলো কবিরাজী পদ্ধতিতে। রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী ও রসরাজ দু'জনে মিলে আশ্রম করলেন এবং বললেন শীঘ্রই মহারাজ ঠিক হয়ে উঠবেন।

এদিকে কম্পনের মৃতদেহ কোলে নিয়ে তার দুই রাণী সহমৃতা হলেন। অর্থাৎ সেকালেও যে সহমৃতা প্রথার প্রচলন ছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাণীদের দোষ কোথায়? কেন তারা সহমৃতা হল—তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বর্ণনা লেখক করেন নি।

উপন্যাসের শেষ পর্বে বিদ্যুম্বালার অন্তর হরিষে-বিষাদে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে মণিকঙ্কণার আনন্দের সীমা নেই। সে এখন রাজার পাশাপাশি সবসময়ই থাকে। মণির কথায় দেবরায় মৃত ভাইয়ের কথা ভুলে যায়। যেন নৃতন জীবনে প্রাণের সঞ্চার করছে এই কুমারিটি। বিদ্যুম্বালারও একটু আনন্দানুভূত হয় এই কারণে যে, অর্জুনের দেখা এখন প্রায় সবসময়ই হয়। কারণ অর্জুন রাজার দেহরক্ষী। বলরাম কর্মকারের প্রেমেও পরিণতির দিকে যাচ্ছে। মঞ্জিরা খাবার নিয়ে আসে না। সে বাপের বাড়ি চলে গেছে। বলরামের মন খারাপ। বলরাম ওর সহ্য করতে না পেরে সেও মঞ্জিরার বাপের বাড়ি যায়। সেখানে গিয়ে সদর্পে বলে, সে মঞ্জিরাকে বিয়ে করতে চায়। মঞ্জিরার বাবা বলে, মঞ্জিরার মত কি এবং যে রাজার বাড়িতেই থাকে তাই রাজারও অনুমতি প্রয়োজন। বলরাম আনন্দে আশ্লুত। সে রাজার অনুমতি পাবেই পাবে। পক্ষান্তরে, বিদ্যুম্বালার মন আর ঘরে বসে না। বাইরে যেকোনো অচিলায় যেতে চায়। অর্জুনের সঙ্গ চায়। পূর্বে কতবার পম্পাপতির মন্দিরে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এখন হয় না কেন। বিভিন্ন প্রশ্ন তার মনে ঘূরপাক খায়। তবে রাজা তাকে কোথায় কাজ দিলেন? এভাবে কিছু দিন কেটে গেল। চতুর্মাস্যও এসে গেল। তিন মাস ব্রত পুরণের আর বেশি দিন নেই। কিন্তু বিদ্যুম্বালা মহারাজা দেবরায়কে বিয়ে করতে চায়না অর্থাত রাজার ব্যবহার তার খুবই ভালো লেগেছে। দ্বন্দ্বে-বিধায় তার দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন বিদ্যুম্বালা পরস্ত বিকেলে পম্পাপতির মন্দিরের দিকে নদীর ঘাটে যাওয়ার সময় অর্জুন তাকে দেখে ডাকতে থাকে। বিদ্যুম্বালা অর্জুনের দেখা পেয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে। অর্জুনের সঙ্গে সখ্যভাব আর প্রণয়-প্রণয়ণীর মত ব্যবহার করে। এতে অর্জুন কিন্তু একটু বিচলিত হয়। সে বুঝতে পারে না যে কুমারি একি করছেন। কোথায় কুমারি আর কোথায় সে। অর্জুন রাজী না হতে চাইলে

বিদ্যুম্মালা বলে—‘তুমি কি আমাকে সত্যই চাও না? আমি কি তবে আঘাত্যা করব? কী করব তুমি বলে দাও।’<sup>৬৭</sup>

এদিকে পিঙ্গলা কিন্তু সমস্তই দেখেছে। বিদ্যুম্মালার বিয়ে হবে মহারাজার সঙ্গে অর্জুনের সঙ্গে তার কি? তারা ভাবছেন পিঙ্গলা তাদের দেখে নি হয়তো। তাই অর্জুন নিম্নস্বরে বলে আমি কি বলব? তুমি যাও, এখনি রাজা আসবেন। আবার সন্ধ্যায় আসবে বলে বিদ্যুম্মালা চলে যায়। এদিকে পিঙ্গলা সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জানায়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দীপের স্থিতি আলোকে বিদ্যুম্মালা অর্জুনদের গুহায় সামনে এসে দাঁড়ালে। জানে বলরাম আজ নেই সে কারণে তার লজ্জা কিংবা সম্মানবোধও নেই। অর্জুনের কাছে গিয়ে গদগদ কর্তে বলে—‘আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।’ দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি অর্জুনের গলা জড়াইয়া লইলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্চাস ফেলিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিলেন।

অর্জুন জগৎ ভুলিয়া গেল। তাহার বাহু অবশে বিদ্যুম্মালার দেহ দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টন করিয়া লইল।<sup>৬৮</sup> অপূর্ব মিলন সম্মোহন। জগতের যেন কিছুতেই আর বাঁধা নেই। বাঁধা যে পড়তে পারে তা তাদের জানা ছিল না। যেন ‘দুঃ কাঁদে দুঃ কোরে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’ এরকমই ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নয়। বহুদিনের পিপাসিত অতৃপ্ত প্রাণের মিলন, পরম পাওয়ার মিলন বলে আমাদের মনে হয়। অতঃপর হঠাৎ দেখলেন কে যেন একজন তাদের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। মোহভঙ্গ হলে তারা দেখতে পায় মহারাজ দেবরায়কে। দু'জনে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে। মহারাজ বললে, অর্জুন বর্মা, অর্জুন বর্মা। নিঃস্তেজ অচল অসার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে, কোনো কথাটিও সরলো না। পরক্ষণেই বিদ্যুম্মালা বলে উঠলো, মহারাজ ওকে ক্ষমা করুন, ওর দোষ নেই। যত দোষ আমার। আমিই ওকে ডেকেছি। আমাকে দণ্ড দিন। পিছনে পিঙ্গলাও এসে হাজির। রাজার আদেশে পিঙ্গলা রাজকুমারিকে নিয়ে গেল। রাজকুমারিও দীনতা প্রকাশ না করে গর্বিতার মতন চলে গেল।

এবার অর্জুন বর্মাকে রাজা প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন—কৃতঘৃতা, বিশ্বাস ঘাতকতার কি দণ্ড? তুমিও যদি সমান দোষে দুষ্ট তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া চাই। না না, যেহেতু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো তাই মৃত্যুদণ্ড দেবো না। তুমি আজ রাত পোহানোর আগেই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। অর্জুন যথারীতি রাজ্য ছেড়ে চলেও যায়, সঙ্গে বলরামও তার পেছন পেছন যায়। কেননা তারা অস্তঃরঙ্গ বন্ধু। পথে যেতে যেতে রাজ্যের সীমানা পেড়িয়ে তারা একটা গুহায় প্রবেশ করে দেখতে পায় অনেক মানুষ পর্বতের গা ধরে ধরে কি যেন তুলছে। বলরাম বুঝতে

পারে।

কামান তুলছে। যুদ্ধের সাজ পরিকল্পনা করছে। বিজয়নগর আক্রমণের ফলি করছে। এরা ম্লেচ্ছ। মুসলমান সৈনিক। যেহেতু কামান গুহার মধ্যে দিয়ে পাচার করা যাবে না সেহেতু তারা কামানগুলো পর্বতের ওপর দিয়ে পাচার করছিলো। এই দৃশ্য দেখে দু'জনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্থির করে যে, অর্জুন আবার বিজয়নগরে আসবে। মহারাজকে মুসলমান আক্রমণের কথা জানাবে। আর বলরাম গুহা পাহারা দেবে। যাইহোক, অর্জুন মহারাজকে খবর দিলে আর বলরাম কামান দিয়ে ম্লেচ্ছ সৈনিকের পথ অবরোধ করতে থাকলেন—দু'জন ম্লেচ্ছকেও কামানেরগুলিতে ঝাঁঝারাও করে দিলে।

এদিকে পূর্ব-দক্ষিণে মহারাজ মন্ত্রি সৈন্য নিয়ে এসে দেখলেন—অর্জুন সত্য কথাই বলেছে। অর্জুনের দেশভক্তি ও বিজয়নগরের প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই মহারাজ তাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বলরামও এল।

একটা ঘটনা সকলের অগোচরে ঘটল। মহারাজ দেবরায় বাধ্য হয়ে অর্জুনের প্রেমের কাছে, দেশভক্তির কাছে, প্রভুভক্তির কাছে হেরে গিয়ে বিদ্যুম্ভালার সঙ্গেই তার বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে। যদিও বিদ্যুম্ভালা তারই উপভোগ্য ছিল তবুও এতবড় ত্যাগ। ইচ্ছে করলেই মহারাজ তাকে ভোগ করতে পারতেন কিন্তু করেননি। বাহুবল দেখাননি। আসলে শরদিন্দু তাঁর অক্ষিত হিন্দুরাজাদের ত্যাগ, পরাধর্মসহিষ্ণুতা, মানবতা, মহানুভবতা ইত্যাদি দেখিয়েছেন। যেমন—‘কালের মন্দির’র স্ফন্দণপ্ত ও আলোচ্য উপন্যাসের মহারাজ দেবরায় প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে ঝুকায়িত ও অক্ষিত। সে যাহোক, বিদ্যুম্ভালার নাম কিন্তু বিদ্যুম্ভালা থাকলো না, মণিকক্ষণার নামও আর মণিকক্ষণা রইল না। মহারাজ তাদের একে অপরের নাম পরিবর্তন করে দিলেন। বিদ্যুম্ভালার নাম হল মণিকক্ষণা আর মণিকক্ষণার নাম হল বিদ্যুম্ভালা। কারণ এতে সাপও মরলো না লাঠিও ভাঙলো না। বিদ্যুম্ভালাকে পূর্বশর্তে বিয়ে করার কথা থাকায় এবং রাজমহলে মহারাজ সম্পর্কে ধারণা সঠিক রাখার স্বার্থে মহারাজ এই ঘটনাটি ঘটালেন। উপায় নেই। বিদ্যুম্ভালা মহারাজকে নয় ভালোবাসে অর্জুন বর্মাকে। তাই জোর করে ভালোবাসা কেড়ে নিলে শান্তি আসে না, প্রেম থাকে না। তাই মনে দুঃখ থাকলেও, রাগ থাকলেও মহারাজ দেবরায়কে মেনে নিতেই হল। এটাই ভবিতব্য। রাজবাড়িতে একই সঙ্গে তিন জোড়া বিয়ে হয়ে গেল। কথায় বলে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

হিন্দু রাজাদের ম্লেচ্ছ যবন মুসলমান বিদ্বেষ; মুসলমান সুলতানদের হিন্দুবিদ্বেষ তখনকার দিনে ইস্তকে দেখা যেত। হিন্দু রাজাদের সৈনিকদের হত্যা করলে তারা—‘শহীদী’র শরবৎ<sup>৬৯</sup> পান করা বোঝাত। মুসলমানেরা হিন্দু সৈনিকদের হত্যা করলে বলত—কাফেরকে মেরে পুণ্য

করেছি ইত্যাদি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, মুসলমান সুলতানরা উক্ষে দিত। সুযোগ বুঝে হিন্দু রাজ্য দখল করত। হিন্দুদের গো-মাংস জোর করে খাওয়াত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক যে ভালো ছিল না তার দৃষ্টান্ত আমরা কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠ করলে সহজেই অনুমান করতে পারি।

অন্যদিকে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যুমালা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগ জীবনের নারী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যায়, নারীর হৃদয়ার্তির চরমতম প্রকাশ। নারীর চাওয়া পাওয়ার অধিকারের কথা প্রসঙ্গ সত্ত্ব অভূতপূর্ব। ব্যক্তিভ্রময়ী, তেজস্বিনী, গর্বিনী নারীর হৃদয় যন্ত্রণা ও ভালোবাসার ছবি এঁকেছেন। লেখক এরকম নারী চরিত্র অঙ্কন করা ‘বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’<sup>১০</sup> ছাড়া কেউ সাহস দেখান নি। ইতিহাসের অলিন্দে অতি আধুনিক নারীর চিত্র অঙ্কনে শরদিন্দু অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত নারীরা সত্যিই প্রেমের প্রতিমূর্তি। আবার একই সঙ্গে যুগপদ স্নেহময়ী ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালয়িত্ব। বিদ্যুমালা প্রেমের জন্য যেভাবে দুর্বার হয়ে উঠেছে তা মধ্যযুগে কোনো নারীর সাধ্য নেই যে, ওভাবে প্রেম নিবেদন করে। সে কিন্তু জয়ীই হয়েছে। পক্ষান্তরে লেখক তার প্রেমকেই জয়ী করেছেন। অন্যদিকে দাসীদের প্রেম প্রত্যাশা, হতাশা ও ব্যর্থতার ছবিও এঁকেছেন অবলীলায়। আলোচ্য উপন্যাসে মঞ্জিরার প্রেমর্তি ও বাঁশি বাজানোর দক্ষতা লেখকের সহানুভূতিরই চিহ্ন। অন্যদিকে পিঙ্গলার সম্মান ও গুরুত্ব এমনকি নারী বাহিনী তৈরি সমস্ত কিছুতেই নারীদের স্থান দিয়ে শরদিন্দু ভারতবর্ষের নারীদের গৌরবান্বিত জীবনকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও এই চিত্রই বিদ্যমান। ‘কালের মন্দিরা’র গোপা, ‘গৌড়মল্লারে’র কুতু, ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘে’র বাঞ্ছলি, ‘কুমার সন্ভবের কবি’র মালিনী এবং ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’র মঞ্জিরা ও পিঙ্গলা প্রমুখ দাসী নারীদের চরিত্র লেখকের পূর্ণ সহানুভূতির ফসল। গুরুত্বও দিয়েছেন সমধিক। মূল নারী চরিত্রের সমান্তরালে গুরুত্বপূর্ণ সহচরীরূপে, সখিরূপে এমনকি কৃটনৈতিক বুদ্ধিদাতা হিশেবে তাদের ভূমিকা উজ্জ্বল। সত্যিই ভাবলে অবাক হতে হয়, শরদিন্দু প্রতিটি উপন্যাসের আখ্যানকে পরিপূর্ণ করে তুলতে দাসী সখি চরিত্রগুলিকে এঁকেছেন সুচিপ্রিয় বুদ্ধি ও ভালোবাসার ফাদুল্পশ্চে।

হাস্যরসের ফোয়ারাও আলোচ্য উপন্যাসটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। চিপিটক মূর্তি, মন্দোদরীর আখ্যান, অর্জুন বর্মাৰ সঙ্গে চিপিটক মূর্তিৰ কথোপকথন, বলৱামের সঙ্গে গুপ্তচর বেঞ্চটাঙ্গা ইত্যাদি প্রসঙ্গে লেখক কৌতুকময় পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের গান্ধীর্যতা থেকে পাঠককে কিছুটা সরস হাস্যময় করে তুলতে চেয়েছেন। যদিও লেখকের এটা বড় গুণ।

প্রতিটি উপন্যাসে তার পরিচয় স্পষ্ট।

অন্যদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের রহস্যময় জীবনকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন—যা উপন্যাসের চরিত্রের গতিবিধি, গতিরোধ ও মনের ক্রিয়াকলাপ পাঠককে জানিয়েছেন আগাম। এটা আসলে ইতিহাস বলার কৌশল মাত্র।

এভাবেই তিনি অতীত ইতিহাস, অতীতের স্মৃতিবিজড়িত ছবি, অতীত জীবন ও সমাজ, অতীত যুগের যত্নগাময় ও অস্থিরময় বাতাবরণকে আধুনিক পটভূমিকায় নামিয়ে এনে পুরাতন কাহিনিকে নোতুন করে পরিবেশন করেছেন। যেন ঐ অতীত জীবনকে অতীত মনেই হয় না। বর্তমানের অস্থির মর্মর জীবন ও সমাজকেই মনে হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে বলরামের কামান বানানোর কৌশল ও ব্যবহার সেকালে কামানের ব্যবহারকে মনে করায়। অনেকে মনে করেন যে, ভারতে কামান বা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার অনেক পরে এসেছে কিন্তু শরদিন্দু তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন, এযোদশ-চতুর্দশ কিংবা তারও পূর্বে ভারতবর্ষে কামান বা আগ্নেয় অস্ত্রের প্রচলন ছিল।

তুঙ্গ ও ভদ্রার সন্ধিলনে তুঙ্গভদ্রার নামটি এসেছে। তুঙ্গভদ্রার একটি ক্ষুদ্র নদী। ক্ষুদ্র হলেও এর একটা গুরুত্ব রয়েছে। কত ইতিহাস কত ঘটনা যে তার গর্ভে লুকিয়ে রয়েছে—কেউ তা খোঁজ নেয় না কিন্তু বিজয়নগর রাজ্যের অতীত ঐতিহ্যের পুনর্চিত্রণ লক্ষ্যে প্রায় তিনশ বছরের সমন্বশালী ইতিহাস পুনরায় শরদিন্দুর লেখায় ধরা পড়েছে। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি ও উত্থানের ইতিহাসও তাৎপর্যময়। কারণ কত রাজা মহারাজা সুলতান এই নদীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছেন—তারই ইতিহাস লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করেছেন। কত শত কাহিনি তার গর্ভে। কত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির যোগস্থল—এই নদী যুগে যুগে মানুষের জীবন ত্রৈণ মিটিয়েছে। তাই লেখক এখানে ইতিহাসকে ভেঙে ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান জীবনের যোগসূত্র করে তৈরি করে নির্মাণ করেছেন ইতিহাসাশ্রিত মহাআখ্যান। বলা যায়, অতীত জীবন, অতীতের কর্মসাধনা, দেশানুরাগ, ধর্মপ্রীতি, সান্তাজ্যনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিজগৎ সমস্তই ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, মেছে বিদ্রে, মুসলিম বিদ্রেও সরাসরি উঠে এসেছে উপন্যাসের আখ্যানে। ইতোপূর্বে ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’ উপন্যাসটিতেও মুসলমান আক্রমণ প্রসঙ্গ এসেছে। তদুপরি সেখানে দেখা যায় দুই হিন্দু রাজার পরম্পর বৈরীতা ও সমঘয়ের চিত্র। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটিতে মুসলমান শাসক আহমদ শা সুলতানের বিজয়নগর আক্রমণ ও অনুজ ভাতা কুমার কম্পনদেবের রাজ্য লাভের ইচ্ছায় মত্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভাতা মহারাজ দেবরায়কে হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসের উপাদান ও

বাতাবরণ হিশেবে।

আসলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছে ছিলো খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার। সেজন্য তিনি ইতিহাসের অনুসঙ্গ, ইতিহাসের চরিত্র, ইতিহাসের ঘটনাবলী ও ইতিহাসের তথ্য ও সত্য ঐতিহাসিকের মত ব্যবহার করেও নিজ কল্পনাবলে কীভাবে সত্যিকারের রস সাহিত্য তৈরি করা যায়, কীভাবে পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ করা যায়—তারই চেষ্টা তিনি করেছেন আলোচ্য উপন্যাসটির আখ্যান নির্মাণে। ইতিহাসকে ভেঙে নবকলেবরে উপন্যাসে পুনর্নির্মিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস এখানে পুনর্নির্মিত। ঐতিহাসিক শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের মস্তব্য একেব্রে উল্লেখযোগ্য—

“...আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া three Musketeers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্যদিয়া তেমনি শশাক্ষের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আগ্নেয়ান্ত্র সম্বন্ধে 'Delhi Sultanate', p. 460 তে আমার মস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইলতুৎমিসের সময়ে না হউক দেবরায়ের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল।”<sup>১১</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মনে করেছিলেন পোতুগীজদের ভারতে আগমনের (খ্রিস্টাব্দ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে ‘আগ্নেয়ান্ত্র’র প্রচলন ছিল।<sup>১২</sup>

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইতিহাসের তত্ত্বজ্ঞ পাঠক ও গবেষক। তাই অনায়াসে যে কোনো ঐতিহাসিক উপাদান, ঘটনাবলী, সভ্যতা নিয়ে ভারতবর্ষের নামজাদা কিংবা ভারতবর্ষের বাইরের খ্যাতিমান ইতিহাসবিদদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, মতামত শুনতেন ও তিনিও যুক্তিসঙ্গত মস্তব্য করতেন। এই উপন্যাসগুলির রচনাকালে বিভিন্ন ইতিহাসবেতার সঙ্গে কথোপকথন তারই প্রমাণ। এভাবে তাঁর ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী<sup>১৩</sup> সর্বোপরি সাহিত্যিক মানসিকতার অপূর্ব মিশ্রণে ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ (রবীন্দ্র পুরক্ষার প্রাপ্তি) উপন্যাসটি সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বলা যায়, বাংলা ভাষায় রচিত হলেও জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সাহিত্য গুণ সম্পন্ন অনবদ্য সাহিত্য হিশেবে উচ্চমর্যাদা লাভ করেছে। এখানেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসান্তির আখ্যান নির্মাণের সার্থকতা।

আলোচ্য উপন্যাসটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমালোচকের সংপ্রশংস ও বিতর্কিত

মন্তব্য চোখে পড়ে। একদা বলা হয়েছিলো এই উপন্যাসটিতে যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতাকে বিনষ্ট করবে। ধ্বংস করবে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিলন ঐতিহ্যকে। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিকায়, তদানীন্তন ভারতবর্ষের আপামর মানুষের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা মনে রেখেই এমন কাহিনিকে বেঁচে নিয়েছেন। ভারতবর্ষকে বৈদিশিক শক্তির হাত থেকে উদ্বার কল্পে সেদিনের মানুষের মনে স্বদেশানুরাগ, স্বাজাত্যবোধ ও দেশ রক্ষার তাগিদ সঞ্চার করবার জন্যই এ ধরণের লেখায় হাত দিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলায় নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা মুসলমান শাসকের অঙ্গুলিহেলনেই ঘটেছে। বাংলার পৌরাণিক সমাজ বা ব্রাহ্মণিক সমাজ সেদিন মহাধর্ম সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এতে পৌরাণিক সমাজের দায়ও অস্বীকার করবার মত নয়। কারণ একদিন ব্রাহ্মণ সমাজ সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষকে মানুষ হিশেবে গণ্য করেন নি। পুরাণে কিন্তু তার প্রমাণ রয়েছে। যাইহোক যখন উচ্চবর্ণের মানুষ মহাধর্ম সংকটে পড়েছেন তখন তারা তাদের রক্ষণশীলতার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিয়ম নীতির শৃঙ্খল শিথিল করে ধর্মান্তরিত মানুষগুলোকে পুনরায় স্বজ্ঞাতে ফেরাতে বিধান দেন। এর কারণ দু'টি—এক. হিন্দুধর্মের বা সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও দুই. ইসলামের হাত থেকে নিম্নবিত্ত হিন্দুদের বাঁচানো। প্রাসঙ্গিক ভাবে পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কবিরা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে উক্ত কাজটিই করেছিলেন। নিত্যানন্দ আচার্যের ‘অঙ্গুদ রামায়ণে’ সেই বিধানের কথা জানা যায়—

“বল করি জাতি যদি লএত যবনে ॥

ছয় গ্রাস অন্ন যদি করায় ভক্ষণে ।

প্রায়শিচ্ছ করিলে জাতি পায় সেই জনে ॥”

তাই বলে ইসলাম ধর্মের মানুষের ওপর হিন্দুধর্মের মানুষের অত্যাচার একেবারেই যে হয়নি তা নয়, বিভিন্ন লেখকের লেখা কিন্তু এই সত্য প্রমাণ করে। তদুপরি ভারতবর্ষীয় ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি আস্থা রেখেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে ভারতবর্ষের একজন নাগরিক হিশেবেই ডেবেছেন। সুতরাং তিনি এখানে হিন্দু বলতে গোটা হিন্দুস্থানের আপামর মানুষকেই বুঝিয়েছেন। মুসলমানও কিন্তু হিন্দুস্থানের বাইরে নয়। কিন্তু যারা ভারতের বাইরে থেকে এসে এদেশ আক্রমণ, দখল ও ধ্বংস করে দিয়েছিলো—তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে জাগাতেই তাঁর এই রচনা। যারা

স্বদেশ আক্রমণ করে, ধর্ম-সংস্কৃতি ধ্বংস করে সে আর যাইহোক না কেন তারা আমাদের শক্তি। একথার সমর্থনে শরদিন্দুবাবু তাঁর ‘কালের মন্দির’ উপন্যাসেও রাজরাণী রট্টা যশোধরার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন ‘...আমার দেশ যে আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শক্তি।’<sup>১৪</sup> অতএব, যাঁরা মনে করেন যে, শরদিন্দুর এই উপন্যাসটি বিতর্কিত তাঁরা একটু গভীরভাবে ভাবলেই বুঝতে পারবেন উপন্যাসটি বিতর্কিত নয়, হিন্দু-মুসলমানের বিদ্রে নয়, দাঙ্গা নয়—আসলে উপন্যাসটি ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, সংকটাপন্থ অস্থির সময়ে ভারতবাসীকে স্বদেশানুরাগে ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বৃত্ত করবার অন্যতম মাইল ফলক। এ প্রসঙ্গে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বক্ষিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ নিয়েও একসময় বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। বক্ষিমচন্দ্র তাঁর জবাবও দিয়েছিলেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে কিন্তু শরদিন্দু সে পথে হাঁটেননি। তাঁর উপন্যাস পাঠে পাঠককেই বুঝে নিতে হয়— উপন্যাসিকের বার্তা কি। বিষয়-আশয়ই বা কি।

সুতরাং শরদিন্দুর এই উপন্যাসটি পাঠে আমাদের বিতর্কিত বলে মনে হয়নি কারণ পূর্বেই সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেদিনের পটভূমিকায় এই কাহিনির প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী অনুভব করেছিলেন মনে মনে। তাই শরদিন্দুও একজন ভারতবাসী হিশেবে সেদিনের প্রয়োজন পূরণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’ উপন্যাসটি কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাষার বুননে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত।

### নির্দেশিকা :

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৯৯
২. তদেব, ১১২
৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১২
৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১২৪
৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৪
৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৭২
৭. R.C. Majumdar, The Classical age, p. 25
৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১২
৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাসিক, পৃ. ২০

১০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ২১
১১. A.L. Basham, The Wonder that was India, p. 91
১২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্গলিত রচনা, দিনলিপি, পৃ. ২৭১
১৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ২৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৭
১৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৪
১৬. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 80
১৭. তদেব,
১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১২৫
১৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১৫০
২০. তদেব, প. ১৪৯
২১. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 79
২২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৪২
২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪
২৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৪৪০
২৫. তদেব, প. ৪৪৪
২৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, ভাদ্র, ১৩৬৫, অসঙ্গলিত রচনা, পৃ. ৪৩৯
২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪

২৮. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 80
২৯. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩
৩০. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ২৬৯।
৩১. V.D. Mahajan, History of Medieval India, S. Chand, New Delhi, 2005, p. 33
৩২. *Ibid*
৩৩. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 145
৩৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৭২
৩৫. অলকা চট্টোপাধ্যায়, দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান, পৃ. ৪৮
৩৬. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol.I, First published by Dacca University, reprinted by BR Publishing Corporation, Delhi, 2004, p. 145
৩৭. *Ibid*, p. 675
৩৮. *Ibid*, p. 675-676
৩৯. *Ibid*, p. 676
৪০. *Ibid*, p. 145-146
৪১. *Ibid*, p. 146
৪২. *Ibid*
৪৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৮৭
৪৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭২
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৭৫
৪৬. তদেব,
৪৭. তদেব,
৪৮. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪২৮
৪৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৩৭

৫০. শূদ্রক, মৃচ্ছকটিকম্

৫১. তদেব,

৫২. তদেব,

৫৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৬৯

৫৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯

৫৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৭৯

৫৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৯

৫৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৩

৫৮. তদেব,

৫৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৯

৬০. জীবন মুখোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, পৃ. ৪১৪-৪১৫

৬১. তদেব,

৬২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫২০

৬৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একত্রিংশ মুদ্রণ,

১৪২০, পৃ. ১৬৪

৬৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড, ছোটগল্প, পৃ. ১৪৫

৬৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭৯

৬৬. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৭৯

৬৭. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৫৮৭-  
৫৮৯

৬৮. তদেব,

৬৯. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৬০১

৭০. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলার মতিবিবি বা লুৎফউর্রিসা

৭১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, অসঙ্গলিত রচনা, পৃ. ৪৪৬

৭২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ৪৮৩

৭৩. তদেব,

৭৪. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু অম্নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ. ১১৫